আমার বই

শ্রীশচন্দ্র দাশ

বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

যে আমার লেখা পড়ে বলে,
ভালো হয়নি

ভূমিকা

'আমার বই'য়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ ধরনের বই প্রথম বাহির করিতে আমার যে একটু সঙ্কোচ ছিল না তা নয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান রসিকজন ইহাকে যে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার আত্মপ্রত্যয়ই জয়যুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ উপলক্ষে আজ তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি।

বইখানার প্রথম সংস্করণে কোন ভূমিকা ছিল না। আমার জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে বলেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধের রূপ ও রীতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা ভূমিকা প্রসঙ্গে বলিয়া না দিলে অনভ্যস্ত পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা হইতে পারে। অবশ্য সহৃদয়গণের ব্যক্তিগত অনুভূতিই আমার একমাত্র ভরসা। বিদগ্ধজনের নিকট যদি আমার দুই একটী কথা অনাবশ্যক মনে হয়, তবে আমি সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর প্রবন্ধের রূপ ও রীতি সম্বন্ধে আমি 'সাহিত্য সন্দর্শন' গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি।

এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে তেমন ভাবে সৃষ্ট হইতেছে না। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তি-চিত্ত এত বেশি দেশ ও জাতি-চিত্তকে জুড়িয়া বসিয়াছিল যে, তাঁহার লেখায় ব্যক্তি-কথা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথে বুদ্ধির দীপ্তি ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে একান্ত ব্যক্তি-কথা ক্বচিৎ আবেগ মধুর হইয়া রূপায়িত হইয়াছে, বীরবলে বুদ্ধি আছে, শ্লেষ আছে, বাক্‌বৈদগ্ধ্য আছে, কিন্তু কোথায় যেন প্রাণের স্পর্শের অভাব রহিয়াছে। আমি মনে করি, এই শ্রেণীর 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধে' লেখকের একান্ত আপনার ভাবনা চিন্তা, এমন কি দুর্বলতা পর্য্যন্ত, নিবিড় রসমূর্ত্তিতে পরিবেশিত হইতে হইবে। তাঁহার খেয়ালই এখানে সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তিনি আপন মনে নিজের কথা বলিয়া যাইবেন, ঘরোয়া কথা, প্রাণের কথা—সহজভাবে, অনায়াসে, অকুণ্ঠিত ভাবে।

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আকাশের তারকা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনতম মাটীর প্রদীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত। এইখানে বিষয়-বস্তু অপেক্ষা উহার আন্তরিক প্রকাশভঙ্গিটীর কৌলীন্যই বেশি। প্রবন্ধের রূপ-বন্ধ সম্বন্ধে সুনির্দ্ধারিত ভাবে কিছু বলা যায় না। লেখক লিখিয়া যাইবেন, আপন মনে, অনিবার্য্য গতিতে। লেখাটী নিজেই রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে—কখনো গল্পে, কখনো স্মৃতিতে, কখনো বিদ্রূপে, কখনো সংলাপে, আবার কখনো বা হাস্যে ও অশ্রুতে। কিন্তু

সর্ব্বত্রই-লেখকের স্পর্শ কাতর মনটী যেন জগৎ ও জীবনের প্রতি অভিযোগহীন হাস্ত দ্যুতিতে লেখাটীকে মণ্ডিত করিয়া রাখে। ইহা যখন সম্ভব হয়, তখন লেখকের আপাতঃ-অসংলগ্ন ব্যক্তি-কথাও—ডাঃ জনসন যাহাকে *loose sally of* ***the mind*** বলেন—নিখিল চিত্ত-কথা হইয়া নিবেদিত হইয়া থাকে। 'আমার বই'য়ের সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, পি-এইচ্ ডি, মহোদয় যাহা বলিয়াছিলেন, উহাতে আমার বক্তব্য সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমি তাঁহার উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি—

'ইংরেজী সাহিত্যে প্রায় এক শতাব্দীর উপর *Essay* বা সন্দর্ভ রচনা সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা মুখ্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *Lamb, Stevenson, Lucas, Beerbohm, Lynd, Chesterton* প্রভৃতি লেখকের মধ্য দিয়া এই ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের হাতে *Essay* একটা নূতন রকমের *art* এ পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে সন্দর্ভ প্রধানতঃ বুদ্ধিগত আলোচনার ক্ষেত্র ছিল—কোন গম্ভীর বিষয়ের গভীর আলোচনা। কিন্তু আধুনিক যুগে ইহা লেখকের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল ও তরল কল্পনা-লীলার বিকাশের দিকেই ঝুঁকিতেছে। মানুষের মন অনেক সময় গুরুভার সমস্তাও অবশ্য পালনীয় কর্ম্মপদ্ধতির চাপ হইতে মুক্ত হইয়া কল্পনা-বিলাস ও দিবাস্বপ্নে বিভোর হইতে চাহে। শরতের আকাশে যেমন লঘু মেঘখণ্ডগুলি উদ্দেশ্যহীন ভাবে মন্থরগতিতে চলাফেরা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের চিত্তাকাশেও অনেক লঘু চিন্তা ও রঙীন রস-কল্পনার উদ্ভব হয়—প্রবন্ধকার সেইগুলিকে ভাবসূত্রগত ঐক্য দান করিয়া মানুষের বিশিষ্ট মনোভাবের সহিত গ্রথিত করিয়া তাহাদিগকে রস সাহিত্যের বিষয়ীভূত করেন। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্রের রচনাগুলি এই শ্রেণীর—তিনি তাঁহার প্রবন্ধগুলিকে বুদ্ধিগত আলোচনার বিষয় না করিয়া তাহাদের মধ্যে কল্পনার লঘু প্রবাহ ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করিয়া সন্দর্ভগুলিকে বিশেষ উপভোগ্য করিয়াছেন।'

বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য, এম এ ও সবিতা প্রেসের শ্রীসুরেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় 'আমার বই'য়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল বলিয়া এই উপলক্ষে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা

শারদীয়া মহাষ্টমী, ১৩৫৭। **শ্রীশচন্দ্র দাশ**

লেখ-সূচি

আমার বই

বই আমার বহুদিনের বন্ধু। জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা পেয়েছি সেক্স্‌পীয়র, কীট্‌স্‌, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ থেকে। এঁদের কাছে আমি চির-ঋণী। কত হেসেছি, কত কেঁদেছি এঁদেব নিয়ে। আমার মনের কথা কী করে যে এঁরা জানেন, তাই ভাবি।

আমার একটা সংস্কার আছে—অন্যের পড়া-বই আমি পড়ি নে। অন্যের লেখা মার্জ্জিন আমার অসহনীয়। আমি নিজে বই কিনি, ভালো ক'রে তাতে নিজের নাম লিখি। অন্যের কাছ থেকে ধার-করা বইয়ে ইচ্ছামত লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দিয়ে, নোট্‌ লিখে' পড়া যায় না। তা' ছাড়া, যে-জায়গাটি আমার ভালো লেগেছে, তা অন্যের ভালো না-ও লাগ্‌তে পারে। যা আমার ভালো লাগে, তার উপর যদি আর কেউ যা তা মন্তব্য করে, তবে কিছু বল্‌তে পারি নে, কিন্তু নিদারুণ ব্যথা পাই। আমি এইটে বুঝি, যা আমার ভালো লাগে, তা শুধু আমার—আর দু' একটি সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে ভালো হ'লেই হয়। আমার ভালো-লাগাটুকু দিয়ে আমি যে নিভৃত আনন্দ, যে অপরিসীম ঐশ্বর্য্য রচনা করি, তা আমার পক্ষে মুক্তি। কিন্তু, তা বলে বল্‌তে চাইনে, আমার ভালো-লাগাটুকুর গোপন মাধুর্য্যই আমার চরম। এঁকে আবিষ্কার করার পর, সীমাবদ্ধ করে, আমার খুশিমত দাগ দিয়ে, মন্তব্য ক'রে, কখনো বা অমুকের সঙ্গে তুলনীয়—ইত্যাদি লিখে রাখি। এটুকু প্রকাশ চাই-ই, তবে অন্যের বইয়ে নয়। যা আমার, তা প্রকাশ করার মধ্যে আমার গর্ব্ব ও আনন্দ; তার অপ্রকাশে আমার সঙ্কোচন, আত্ম-নিগ্রহ, অভাবনীয় যন্ত্রণা ও অন্তর্দাহ। অধিকার যেখানে অপ্রকাশের পীড়নে অবরুদ্ধ, অধিকারের মর্য্যাদা সেখানে ক্ষুণ্ণ। আমার এই

সাধারণের-চোখে ক্ষুদ্র অধিষ্ঠান ভূমির উপর আমি একটি ভগ্‌লারের মত চিন্ময় সুর সৌধ রচনা করি।

বইটিতে যখন আমার নাম লিখি, মনে হয় এখানে যে-কারো নাম লেখা হ'তে পারতো। আবার মনে হয়, আমার বলেই এটি আমার হাতে এসেছে। এ যেন আমার জন্মান্তর সুহৃদ। নাম লিখে, কখনো বা দু' এক লাইন কবিতা লিখি, কখনো বা যা-খুশি ছবি আঁকি—রীতিমত মৌলিক ছবি। বইখানাকে আমার মনের মত করে সাজিয়ে তুলি, সাজাতে না পারলে আপনার অক্ষমতায় খান্ খান হয়ে পাড়ি। আমি নিজে রাফেল্, বটিচেলী, লেওনার্দো দা ভিঞ্চি বা অবনীন্দ্রনাথ না হ'তে পারি, তবু আমার ছোটটুকুই আমার সব। গ্রন্থকার, ভাড়া ক'রে কোন শিল্পীর সাহায্যে প্রচ্ছদ-পট চিত্র-শোভিত করে দিলেও, তাতে আমার মন ওঠে না। কারণ, ওখানে যে আমি নই।

তারপর, বইখানা পড়ি—একমনে তা'র মনের কথা (সাজানো কথা বা ভদ্রতার কথা নয়) শুনে যাই কখনো বা চোখে জল আসে, কখনো আনন্দে আত্মহারা হই ; আবার কখনো বইখানা বুকে নিয়ে পরম-নির্ভরতায় ঘুমিয়ে পড়ি।

আমার পড়বার একটা রীতি আছে। কতকগুলো বই দেখেই বিদায় দিই। এদের আকৃতি ও দু'চারটে পৃষ্ঠা হ'তেই বুঝি, এরা বাজে। বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলী বা *Everyman's Library*-র বই, 'কমলিনী সাহিত্যমন্দিরের' রং-বেরং-এর বই বা 'সিঁথি মৌরের' মত রূপ-লাঞ্ছিত বইয়ের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি। মানুষের মধ্যে যেমন চাই প্রাণটি, বইয়ে চাই তার ভিতরটি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলেন, প্রাণ নিয়ে কেউ বাঁচে না।

বাইরের সাজ অতি সহজ—সেখানে লাগে আমার মন ও রুচি। যাঁদের ভিতরটা ভালো নয়, তাঁদের বাইরের প্রসাধন-সৌন্দর্য্য তো কুৎসিত—তাঁরা শরৎচন্দ্রের 'রাসবিহারীর' মত স্বার্থের জন্যে ঠোঁটের আগায় মিষ্টি হাসি ঢেলে কথা কয়, আবার বুকের ভিতর ছুরি শানায়! তুলার প্যাডে বাঁধানো সোনার জলে নাম-লেখানো রজনী সেনের 'বাণী' ও 'কল্যাণী' বের হওয়ার আগেই তিন আনা দামের বই দু'খানা আমি পড়েছিলাম, এ বল্‌লে যাঁরা লজ্জা পাবেন, তাঁদের কাছে আমিই লজ্জিত।

দুনিয়ার সব বই পড়া অসম্ভব। অনেক বই জ্ঞানবৃদ্ধদের মুখে-পড়া শুনেছি, অনেকগুলি কেবল দেখে গিয়েছি, আর ক'খানা বার বার পড়েছি। 'অমুকের ভূমিকা সমেত'-জাতীয় বই আমি পড়ি নে। পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ নেই। যে-বই সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেনি, অন্ততঃ, 'লেখকের একটা নিজস্বতা আছে' এতটুকু মন্তব্য যার সম্বন্ধে হয়নি, তা' আমার বেশি আগ্রহ জাগায়। পরের মন্তব্যই আমার কাছে বড় কিছু নয়। লেখক প্রশংসাকারীর অনেক ঊর্দ্ধে—অথচ তাঁকে ছোট ক'রে অপমান করা কেন? তাই, অনেক সময় আমি অপ্রশংসিত বা বহু-নিন্দিত বই-ই পড়ি। Ibsen-এর *A Doll's House*, Hall Caine-এর *The Woman Thou Gavest Me*, Hardy-র *Jude the Obscure*, Shaw-র *The Adventures of the Black Girl* বেশ লাগে। শুনেছি, এসব বই নাকি একটা ভাঙ্গার-যুগ এনেছিলো। এদেশের যে সকল বইয়ের বিরুদ্ধে কেউ কেউ খড়্গ-হস্ত হ'য়ে উঠেছেন, তা' পড়ে তেমন খারাপ কিছুই পাইনি। অতি সাধারণ ব্যাপার! তাতে আছে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভুয়ো আদর্শবাদের বিরুদ্ধে দারুণ আক্রোশ! এইটে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সাহিত্য চিরদিনই বিগত যুগের

প্রতিক্রিয়া রূপেই আসে। সাহিত্যের উপর অশ্লীলতার ছাপ মেরে দে'য়ার বিশেষ কোন কারণ পাইনে। সাহিত্য চিরদিনই শ্লীলতা-অশ্লীলতার ঊর্দ্ধে—ওখানে শুধু আনন্দ। এ আনন্দ যেন 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর'।

উপদেশাত্মক বই আমার চক্ষুশূল। 'বাল্যশিক্ষা' 'সুনীতি-শিক্ষা', '*Moral Selection*' প্রভৃতি পড়িয়ে যত নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, তত আর কিছুতে হয়নি। এক ভদ্রলোক সম্বন্ধে শুনেছি—তিনি নাকি বাড়ীতে শরৎ বাবুর বই রাখ্‌তেন না, পাছে, তাঁর ছেলেমেয়ে 'চরিত্রহীন' হয়ে পড়ে! যে-শরৎচন্দ্র বাংলার নির্লজ্জ সমাজ-জীবনের আত্মঘাতী বেদনাকে রূপ দিয়েছেন, তাঁর অত দোষ? শুনেছি, ভদ্রলোক যে-ভয় ক'রতেন, তাই নাকি তা'র ঘটেছিলো। শরৎ বাবুর এ'তে কোন হাত ছিল না, এইটে জেনেই হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মনে হয়, যে বই-যে, এটা কোরোনা লেখা, তা বেশি ক'রে, ঐ বোধই জাগিয়ে তোলে। তাই আমি চন্দ্রনাথ বসুর সংযম-শিক্ষা জাতীয় বইয়ের বিরোধী।

বইয়েতে কোন প্রতিপাদ্য বিষয় থাকার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। (জ্যামিতি-পরিমিতির কথা বল্‌ছিনে) যা যেমনটি হয়,লেখক তা'র প্রতি গভীর সমবেদনা জাগিয়ে, আনন্দে অশ্রুতে আমায় ভরে দিলেই যথেষ্ট। উপদেশ দিতে হয়, তা যদি 'কান্তাসম্মিত' হয়, আমি এক্‌শোবার নেবো। কিন্তু, আমার মনের উপর জুলুম ক'রে নয়, আমায় অভিভূত ক'রে যা'-খুশি লেখক বল্‌তে পারেন। জ্ঞানের বিষয়কে অনুস্বার বিসর্গ যোগ ক'রে গুরুগম্ভীর ক'রে বল্‌লে ভয়-সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু প্রাণ স্পর্শ করতে পারে না। সাহিত্য প্রাণের জিনিস। সুতরাং, জ্ঞানের কঠোরতাকে যিনি হাসির পুষ্প-পেলবতায় পরিবেশন করেন, তিনিই আমার প্রিয়।

বইয়েতে আমি চাই, লেখকের মনের কথা—জীবনের কথা, সত্য আবিষ্কারের কথা। তাঁর কামনার বিষ-পুষ্প যেখানে গোলাপ হ'য়ে ফুটে ওঠে, অনুভূতি যেখানে সঙ্গীত হয়ে ঝরে পড়ে, ঝরণা হয়ে বয়ে যায়, তারই মধ্যে আমার অসংখ্য নবজন্ম।

গদ্যের চেয়ে কবিতা আমি বেশি পড়ি। কারণ, তাতে মনের বেশ একটি অবকাশ সৃষ্ট হয়। মনটি যেন ছোট্ট একটি মধু-কেন্দ্রকে বার বার ঘুরে আসে। কবিতা পড়তে পরিশ্রম কম। গদ্য বইয়ের চার ইঞ্চি দীর্ঘ শ্রান্তিহীন পংক্তিগুলি আমাকে ক্লান্ত না ক'রে ছাড়ে না। কবিতার পংক্তিগুলি কী আরামের! কী হাল্কা—টুক্ ক'রে শেষ হয়ে যায়—একটি মাত্র ঝঙ্কার! তারপর, ঐ যে মার্জ্জিন—যেটি কবিতার বই-য়ে বেশি থাকে, তা আমার পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। ঐ শাদা জায়গাটা—অক্ষরের অতীত, কালির আঁচড়ের উর্দ্ধে যে শুভ্র-বিস্তার—তা' আমার কল্পনার চারণ-ভূমি। সেখানে আমি টেনিসনের কমল-বিলাসীর মতো আলস্য-আবেশ উপভোগ করি। সব চেয়ে বড়ো কারণ বোধ হয়, খুব কম সময়ে বেশি পৃষ্ঠার বই পড়তে পারি। রোজ একাধিক কবিতার বই পড়া কি কম কথা? *The Newcomes, The Forsyte Saga* বা 'অপরাজিত' নিয়ে বস্‌লে আর উপায় নেই। কিন্তু, Morris-এর *The Earthly Paradise* পড়তে আমার এতটুকু অবসাদ আসেনি। *The Ring and the Book*-এর মতো একখানা বই না থাক্‌লে কী যে হ'তো আমার, তাই ভাবি। তবে, কবিতা মনে ক'রে ক'খানা বাংলা মহাকাব্য ('মেঘনাদবধ কাব্য' নয় কিন্তু) পড়তে গিয়ে দেখি, ওরা নেহাৎ তৃতীয় শ্রেণীর পদ্য।

চিরদিনের জন্যে রাখা যায়, এমন কোন বই আমি অনেক

দিন পাইনি। অনেক বই ভাল লাগে, কিন্তু তারা মনে ছাপ রাখেনা; এসব প্রজাপতি-প্রকৃতি বই আমার ধাতে সয়না। তারপর, বহু প্রতীক্ষা-রজনী শেষে আমার ঈপ্সিত আলোর সন্ধান পেলাম—আমারই অতি কাছে। ছোট্ট একখানি কাব্য—সহজ, সরল, নিবিড়, মুক ও মুখর, সংযত ও উচ্ছ্বসিত—অনির্ব্বচনীয়। খুব ভালো লাগ্‌লো। ত্রিশঙ্কুকে শূন্যপথে কেউ আসন পেতে দিলে, তাঁর পক্ষে যেমন তৃপ্তিকর হতো, আমারও তেমনই হলো। এটি সত্যিকার আমার কিনা, কত অগ্নি-পরীক্ষায় তার প্রমাণ হলো। এতো ভালো লেগেছিলো যে, এর উপর নাম লিখ্‌তে প্রথম সঙ্কোচই হলো। যতবার একে সাজাতে যাই, ততবার যেন আমার আয়োজন-সম্ভার হীনপ্রভ হ'য়ে পড়ে। কখনও বইখানা আমার সাম্‌নে খুলে রাখ্‌তাম এর প্রণতির মতো নিবেদিত, স্তুতির মতো উদ্ধায়িত রূপ-মাহাত্ম্যে বিভোর হয়ে থাক্‌তাম। কখনো বা খুব ভালো কাগজের জ্যাকেট পরিয়ে এর সৌন্দর্য্য দেখ্‌তাম। শেলি বল্‌তেন, মানুষের কল্পনা ও বাস্তব কখনো এক হয় না। আমি বলি, হয়-হতে পারে—যেমন হয়েছে আমার এ-ক্ষেত্রে। এই বইখানা আমার বাস্তব ও আদর্শের পরিপূর্ণ মিলন। দান্তের কাছে বিয়েত্রিচে, জয়দেবের কাছে পদ্মা, বিল্বমঙ্গলের কাছে চিন্তা, পুণ্ডরীকের কাছে মহাশ্বেতা যতখানি, এ আমার ততখানি।

বহুদিন বইখানায় নাম লিখিনি। কী লিখ্‌বো? এর অন্তর বাহির সমস্ত জুড়ে' আমি, শুধু আমি—তাই নাম লিখে আর এমন কী অধিকার স্থাপন করবো? তবু, তবু লিখ্‌লাম অধিকারের অক্ষয়-চিহ্ন রূপে! সহসা একদিন দেখি, আমার বইখানা—সেই বইখানা আমার কাছে নেই। বিশ্বাস করতে পারিনি, যে আমার,

সে দূরে যেতে পারে। নিরুপায় হয়ে কাঁদছি, এমন সময় বিহারী ছোক্‌রাটা বল্‌লে, 'বাবু, আপনার বই'। অবাক্ বিস্ময়ে, আত্মঘাতী অভিমানে তার দিকে ফিরেও চাইনি। বোবা বই সেদিন কোন কথা কয়নি। অথচ এরই সঙ্গে আমার কত একাত্মতা। একসঙ্গে দু'জনে বেদনার অশ্রু ভাগ করে' নিয়েছি, আনন্দের রস-পুষ্ট দ্রাক্ষারস পান করেছি বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করেছিলাম বলেই কি সে আমায় ফাঁকি দিয়েছিলো? তার কোনো অপরাধ হয়েছে কিনা সে-বিচার আমি করতে চাইনে—নিজের কথাই বলি। তবে কি সবই আমার ভুল? না হতে পারে না। আর যদি হয়েই থাকে, তবে—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী।

যাক্, আমার অভিমানের আয়ু বড়ো কম। নিজেই তা'কে টেনে নিলাম। দেখি, কে যেন আমার দে'য়া দাগগুলি উঠিয়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করেছিলো। এবং আমার দে'য়া সবুজের জ্যাকেট্‌খানা ছিড়ে ফেলে মার্বেল কাগজের মলাট দিয়েছে। কিন্তু, আমার সে অধিকার-চিহ্ন তেমনি অম্লান। তাই সেদিন ক্ষমা করলাম, নয়তো একটা খুন হয়ে যেতো—মানুষ নয়, বই।

ইজি-চেয়ার

ইতিহাস অনেক কথাই লেখে, কিন্তু মুচিরাম গুড় কোন্ সাল পবিত্র করতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা লেখে না—প্রয়োজন বোধ করে না। ইজি-চেয়ারও কে আবিষ্কার করেছিলেন, তার ইতিহাস নেই। তা না থাকারই কথা—এ যে উচ্চবাচ্য করে না, নেহাৎ ভালোমানুষের মতো শুধু নিজের কর্ত্তব্যটুকু পালন করে যায়। ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বে মন বিষিয়ে ওঠে, এর কথাই বার বার মনে হয়। এ যে পত্রলেখার চেয়ে উপেক্ষিতা!

ইজি-চেযার—কী শান্ত নামটি। এর মধ্যে উদ্বেলতা নেই, একটি সুগভীর শান্তি যেন একে ঘিরে আছে। এ নিজে খুব মিশুক নয়, এক কোণে পড়ে থাকে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে এর এতটুকু অভিযোগ নেই। এ শুধু বলে—

যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই

একজন নামজাদা লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। সত্যি, ভদ্রতা এর অপরিসীম—এ শুধু মুখে মিষ্টি কথা কয় না, এর প্রাণটিও স্নেহে ভরপুর হয়ে আছে। জীবনে এ কাউকে এতটুকু বেদনা দেয়নি। মৌখিক ভদ্রতা এ জানে না—এ জানে অন্তরের আত্মসমর্পণ। এ আয়েষার মতো —মূর্ত্তিমতী সেবা।

সব চেয়ে ভালো লাগে আমার, এর চাহনিটুকু। এর ভাষাহীন আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার মতো নিষ্ঠুরতা আমার নেই। বাসবদত্তা যদি এর মতো মিনতি নিয়ে উপগুপ্তের কাছে কামনা জানাতো, হয়তো সে সফল হতো। ঘরের মেজেতে চেয়ার টেবিলগুলো আত্ম-

গরিমায় বিস্ফারিত হয়ে মাথা উঁচু করে দম্ভ করে; তাদের অগোচরে, এর মরমের ঢেউ এসে আমায় প্রেমিকার মতো স্পর্শ করে। এ আমাকে এতটুকু বেদনা দিতে চায় না, তা হ'লে যে এর বেঁচে থাকারই অর্থ হয় না।

এ যে কত বড়ো অভয় আশ্রয়! একে দেখে ভরসা পাই। আবার ভয় হয়, কে জানে? আমারই জন্যে এ প্রতীক্ষা করে, এ-কথা ভাবতে ভালো লাগে বই কি? আমি না থাক্‌লে এ আন্‌মনে বসে থাকে, এর বুক খালি হয়ে ওঠে, আর আমায় দেখ্‌লেই এ হেসে ওঠে, গেয়ে ওঠে, খুশিতে ভরে ওঠে—এ কি কম কথা? কী যে এর আব্দার! এ যেন কেমন করে বুকে চেপে রাখে—একটু-খানি অবশ-করা আলিঙ্গনে এ সকল কিছু ভুলিয়ে দেয়। মনে হয়, কী লাভ এত পরিশ্রম করে? ফুল? —সে তো এমনি করেই ফোটে, বাতাস—এমনি করেই ছোটে, গাছ—এমনি করেই বাড়ে। তবে, আমার আবার কাজ-করা কেন? এর কাছে এলেই বুঝি, সহজ-জীবনের আনন্দ দে'য়ার ক্ষমতা কত বেশি।

জীবনের অনেক সময় অনেক কিছু না হলেও কিছুই হয় না, কিন্তু একে না-হ'লেই হয় না। মনটা যখন ভালো লাগে না, তখন এর চেয়ে আপনার জন আর কে আছে? এর সুগভীর স্নেহ আবার পীড়াও আমায় কম দেয় না! কারণ, এর কাছে আমার দাবির অন্ত নেই, অথচ, মুখ ফুটে এ কোন-কিছু আমার কাছে চায় না। যেটুকু দিই, তাকেই সে দুর্লভ বলে গ্রহণ করে। এক একবার আমার মনে হয়—না, এর দান আর নেবোনা। সত্যি, কেন সে আমার জন্যে এতটা করবে? কী গরজ তার? যতই তার দান গ্রহণ করছি, ততই যেন নিজকে ঋণী করে

ফেলছি। শেষে যে দেউলে হয়েও তার ঋণ শোধ করা হবে না।

এ পুরানো, আবার 'নিতুই নব'। খেয়েদেয়ে দুপুরে একে পাই একভাবে, শ্রান্তদেহে ক্লান্তপদে পাই আর এক-ভাবে, আবার গল্পের আসরে চায়ের কাপে মুখ রেখে একে পাই সুরসিকা আনন্দ-উচ্ছলা রূপে। গল্প করবার সময় এর ভারি প্রয়োজন। চেয়ারে বসে গল্প চলে না—একেবারেই চলে না। ডাঃ জন্‌সন্ যদি ইজি-চেয়ারে না শুয়ে নিতেন, তবে আর অম্‌নি নিজের ভুল বুঝেও বান্ধবীর সঙ্গে রসিকতা করতে পারতেন না। তারপর, এ না হলে খবরের কাগজ পড়া যায় না, অসম্ভব। আর, মাসিক কাগজগুলোও পড়ার একমাত্র স্থান এইটে। এ না হ'লে যে একটা পরিবেশই সৃষ্ট হয় না। স্বীকার করি, এতে বসে 'মেরিডিথ্' বা 'স্মর-গরল' পড়া যায় না। (মানে, পড়া যায়, বুঝা যায় না)। বোবার মতো, বোকার মতো, অসহায়ের মতো অবস্থা হ'লে, এর মতো আর একটি দোসর নেই। কিছু করাটাই যে জীবনের সব, একথাও মান্‌তে আমি পারিনে। তবু দেখি, সবাই কিছু-না-কিছু করেই। ইজি-চেয়ারে বস্‌লেই কিন্তু আমার মনে হয়, কিছু না-করাটাই একটা ভীষণ দরকারী কাজ।

কথা-বলা

কথা-বলা এমন একটা জিনিস, যা সবাই আয়ত্ত করতে চায়, পারে না। আমি কিন্তু ছোট্ট শিশুর আধো আধো বাণীর কথা বল্‌ছি নে। ওসব কথা, কথা নয়—কথার উপক্রমণিকা। ওদের অর্থ হয় না বলেই ওরা মিষ্টি, আর সত্যিকারের কথার অর্থ না হ'লেই ওটা হয় অনাসৃষ্টি।

বহুদিন আগে একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে, প্রেমিক-প্রেমিকারা যে-সব কথা বলেন, তার নাকি অর্থ হয় না। তারপর, একটি বাঙ্গালী কবির—

অর্থ-বিহীন তোমার কথা তাও লাগে ভালো

—এই একটি-মাত্র পংক্তি পড়ে আমার ধারণা নড়চড় হ'বার উপক্রম হ'ল। ভালো লাগে?—অর্থ-বিহীন কথা? যারা এসব বলেন, তারা কি প্রকৃতিস্থ জীব নয়? ভারি বিপদে পড়লাম—কিন্তু এ যাচাই করার জো নেই। অর্থ-বিহীন কথার মধ্যেও যদি অর্থ থাকে, তবে সেটা নিশ্চয়ই ভাষাগত নয়, ভাবগত।

নৃত্যকলা যেমন আর্ট, কথা-বলাও তেমনি ততোধিক আর্ট। এ কেবল বল্‌লেই হয় না। কথা-বল্‌তে গিয়ে সহসা যারা আনমনা হয়ে পড়েন, তাদের অশোভন বিপত্তির জন্যে আমার করুণা হয়। আবার যারা কাজে অকাজে একটার জায়গায় পাঁচটা কথা বলেন, তাদের সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ ধারণা, তারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় মর্ম্মার্থ লিখ্‌তে পারেন নি। সংসারের অনেক লোক কথা বেচে না, কেবল কেনে। এরা পলোনিয়সের ভক্ত। এদের মনের দরজায় চিরদিনের জন্যে তালা-দেওয়া।

অনেক লোক বেশ্ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। এদের কথা যেন গানের মতো, ফুলের মতো, আলোর মতো। কার না এদের ভালো লাগে? কিন্তু, যারা নিজেই কেবল কথা বলেন, অন্য কাউকে বল্‌বার অবকাশ দেননা—তারা বড্ড বেশি আত্ম-সচেতন। তাঁরা চার্চিলের মত অবিরাম প্রবাহ—ঐরাবত পর্য্যন্ত তাঁরা ভাসিয়ে নিতে পারেন। আমার একজন বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক, ম—, অবিরাম দশ ঘণ্টা কথা বলে রেকর্ড রেখেছেন। তবে, তাঁর মজা এই, তিনি বাস্তবিকই কথা বল্‌তে পারেন। যখন যা বলেন, মনে হয়, তার মধ্যে কোন খট্‌কা নেই। তিনি যেন একটা নৃত্য-চপল ঝর্ণা, আপন মনে বয়ে যান, তখন আর শ্রোতার কথা তাঁর মনেই থাকেনা। তাঁর কথা যেন অদম্য উৎসাহ, অভাবিত প্রেরণা ও আত্ম-মুক্তি। তিনি অন্য কারো কথা শোনেন না, কেবল নিজে বলেন। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দে অমোঘ যাদু, তাঁর উচ্চারণে অপরিমিত শক্তি, তার বচন-ভঙ্গীতে প্রাণস্পর্শী নাটকীয়তা। এ-ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলা যায় না, এদের কথা শুনতেই হয়। এদের অস্বীকার করার জো নেই।

অনেক লোক কথা বলেনা—বলায়। কেউ যখন কিছু বলে, নিজে কোনো মতামত দেয়না, শুধু সায় দিয়ে যায়। এদের নিয়ে আসর জমেনা—এরা ভক্ত শ্রোতা হতে পারে, কিন্তু এরা মোটেই অনুপ্রাণিত করেনা।

কথা-বলাটা অনেকটা নির্দ্দোষ দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো। পরস্পরের তীরায়িত শব্দ-প্রয়োগে বা সূক্ষ্ম শ্লেষাত্মক বাণীবিন্যাসে কথার প্রবাহ স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। এরূপ বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে আমরা বন্ধুদের অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করি। র—'র কথা মনে পড়ে। সে যা মনে করে, তা বলেনা। উদ্দেশ্য, আত্মগোপন নয়, জমানো—

আর, পরোক্ষে অন্যের চিন্তাধারা আবিষ্কার করা। সবাই যাকে প্রশংসা করে, সে তাকে প্রথম হতেই নিন্দা শুরু করে দেয়। এমনি করে অপরকে চটিয়ে নিয়ে সে আবার ঠিক পথে চলে আসে। তার একটা গুণ, প্রকাণ্ড ভুয়ো কথা অতি সুন্দর করে সাজিয়ে বিশ্বাস্য করে সে বল্‌তে পারে। একদিন সন্ধ্যেবেলা, আমি একা—হাঁ, একান্ত একা—বসে আছি। জানিনে, অকারণে কি সকারণে, মনটি যেমন থাকা উচিত ছিলো, তেমনটি ছিলো না। সহসা সে এসে বল্‌লে 'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা।' আমি ব্যাকুল আগ্রহ ভরে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। সে ভূমিকা যা' করলে, তা বার্ণাড্‌ শ'র বইয়ের মতো—এ যেন বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। ভূমিকা-শেষে সে বল্‌লে, 'আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি, তুমি—হাঁ, তুমি কী করে এমন একটা কাজ করলে! তোমার উপর আমার তো তেমন ধারণা নেই।' আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম তন্ন তন্ন করে দেখি, এমন কিছু করি নি, যাতে আমার বিরুদ্ধে সে নালিশ আন্‌তে পারে। কিন্তু তার মুখে ছিলো গভীর একটা সত্যের আভাষ, তাই উপায় ছিলো না। যাক্‌, অজ্ঞাতসারে যদি কিছু করেই থাকি, এ-কথা ভেবে আমি আরো মুষ্‌ড়ে গেলাম। তারপর সে বল্‌লে—'বাজে, মিথ্যে কথা—শুধু তোমাকে উদ্বিগ্ন করবার জন্যে বল্‌লাম।' বাঁচা গেলো, একটা ভূত যেন ঘাড় থেকে নাবলো। অকারণ আশঙ্কা হতে মুক্তি পেয়ে মনটা যেন লঘু হ'ল।

অনেক লোক আছেন, যারা ঘরে কথা বল্‌তে পারেন, বাইরে একেবারে ভ্যাবা গঙ্গারাম। শিখিয়ে দিলেও এদের অবস্থা দীনবন্ধু মিত্রের নদেরচাঁদের মতোই হয়। নেহাৎ পরিচিত জন কয়েকের মধ্যে বলেন না, এমন কোন বিষয় নেই বা ভাষা নেই। অপরিচিত একটি হ'লেই একেবারে বোবা—মুখে আর তাদের কথা সরেনা।

এ-কথা ঠিক, কথা জমাতে হ'লে সমধর্ম্মী লোক চাই। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। পাঁচ-মিশেলি সভায় কথা জমেনা। কারণ, অনেকের কাছে মানুষ কখনো অকপট হতে পারে না। মানুষ যখন একা, তখনি সে সব চাইতে অকপট। দু'জন হ'লেই কপটতা অদৃশ্য ছিদ্র-পথে মনসার মতো প্রবেশ করে। এ জন্যেই সমপ্রাণ না হ'লে কথা জমে না। সেখানে ঐক্য নেই, প্রমাদ আছে।

যারা বেশ্ কথা-বল্তে পারে, তারা গভীর জ্ঞানী না হতে পারে, কিন্তু বহু-বিষয়ে তাদের অধিকার থাকা অসম্ভব নয়। যিনি বাংলা ইংরেজী অর্থনীতি দর্শন ইতিহাস ভূগোল সবই কিছু জানেন, তিনি তো রীতিমত উৎসব! অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েও তাঁর দম্ভ নেই— সুরভির মতো তাঁর স্পর্শ, গতিশীল তাঁর চিন্তাধারা।

কথা-বলার মধ্যে যেখানে কেবল লাভ-ক্ষতির টানাটানি, সেখানে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠি। কয়েকজন বন্ধু মিলে অনর্গল বিষয় হতে বিষয়ান্তরে তর্কের তুমুল প্রবাহ ছুটিয়ে দিতে আমার খুব ভালো লাগে। তবে, সত্যি বল্তে কি, অনেক সময় আমি নিজেই আর খেই পাইনে, বাধ্য হয়ে লাজুক হয়ে পড়ি। সব চেয়ে উপভোগ করি, যখন করুণ হতে অকরুণে, শিখর হতে ভূতলে, লঘুতা হতে গম্ভীরতায় বিচরণ করতে পারি। ধরুন, 'রথযাত্রা' নিয়ে কথা আরম্ভ হ'ল। তারপর, বয়ে চল্লাম—"রথ—পুরী—সমুদ্র—হ্রদ—চিল্কা—মানস-সরোবর—কমল—শরৎচন্দ্র ('শেষপ্রশ্ন' মনে করুন)—রবীন্দ্রনাথ—বাঙ্লা দেশ—আসাম—চেরাপুঞ্জী—চায়না—নাক্স-ভমিকা—হ্যানিমান্—বোরিক্ ট্যাফেলস্ এণ্ড কোং—আমেরিকা—উইলসন্—ফ্রান্স রোমাঁরোলাঁ ঠাকুর রামকৃষ্ণ—বেলুর—কলিকাতা—লেক্—আত্মহত্যা··· থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। রথযাত্রায় যাত্রা করে মহাযাত্রা পরিণতি হবে জান্লে, কিছুতেই কথা-বলতে শুরু করতাম না।

উপায় নেই। তবু, এমনি করে কথার ভাটিয়াল স্রোতে বয়ে যেতে কতই না আনন্দ। এ ভাবে কথা যখন জমে ওঠে, তখন যদি কেউ চুপ করে শুধু শোনে আর শোনে, আর ভিতরে ভিতরে বুদ্ধি আঁটে, তবেই আমার শেষ আর কি! আমার মনে পড়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি কথা—

মুখ হল্‌সা, ভেতর বুঁদে, কানতুল্‌সে, দীঘল ঘোমটা নারী,
পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল বড় মন্দকারী।

সব চেয়ে অপমান, সবচেয়ে মানসিক অশান্তি, যখন আমি কথা বলি, অথচ উত্তর পাইনে। কথা-বলাটা দু'জনের, একের নয়। যার সঙ্গে কথা বলি, সে যদি মৌন হয়ে বসে থাকে, ভারি আহত হই। ইচ্ছা হয় বলি, 'থাক্, আমার-ই বা এত কী?' কিন্তু এটুকু বলেই যদি উঠে পড়ি, সহসা দেখি মৌনীর মুখেও ভাষা আসে, উচ্ছ্বাসের বিগলিত ধারায় সে সকল অভিমান ভাসিয়ে দেয়। কী করে যে এটা সম্ভব হয়ে ওঠে, আমি তো নিজেই বুঝি নে। থমথমে আকাশটার এক পাশে যেন এক টুকরা হাসির রামধনু ফুটে ওঠে। আমার ধারণা ছিলো, মুখেই শুধু কথা বলা যায়, কিন্তু, এ দেখলে মনে হয়, ভাষা শুধু মুখের নয়, বুকেরও, চোখেরও। এটুকু জেনেই কথা-বলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'বার প্রচেষ্টায় পরাজয় স্বীকার করলাম।

অভিধান-দেখা

লজ্জা হ'লেও আজ আর এ-কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ছেলেবেলা অভিধান দেখ্‌বার অভ্যাস আমার ছিলো না। সপ্তম শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ইংরেজীতে অনেক কথাই বল্‌তে পারতাম। মনে হতো, ইংরেজীটা শিখে ফেলেছি। বিশ্ববিদ্যালযের দেউড়ি পার হয়ে বুঝ্‌তে পারলাম, কিছুই শিখিনি। শেষের সীমানায় এসে 'রীতিমত নাটকের' একটা কথাই মনে হ'ল—*Begin from the very beginning.*

আমার মতো যারা অভিধান দেখ্‌তে অলস ও কুণ্ঠিত, তাদের ব্যক্তিগত কারণ আমি জানি নে। আমার কুণ্ঠার বিশেষ কারণ ছিলো। কোনো শব্দের অর্থ না জানলেও অনুমান করে নিতাম—এবং এত প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস আমার ছিলো যে, অভিধানে থাক্ আর নাই থাক্, আমারটিই ঠিক। (ঠিক যে নয়, তা কি আর আমি বুঝি নি ? তবু, তাই করতাম)। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, বার বার অভিধান দেখ্‌লে পড়া এগোয়না, মনে হয়, সেই এক লাইনই বুঝি নি। সবাই বোঝে, আমিই কেবল বুঝি নে, এ-কথা বোকাও স্বীকার করে না। এ দুর্ব্বলতা আমার ছিলো বলেই অভিধান দেখ্‌তাম না। যেমন, অনেকে যে-টকি দেখে যত কম বোঝেন, তাকেই বলেন, কী স্পষ্ট, আমারও তেমনই বল্‌তে হ'ত, উপায় নেই—বোকা প্রমাণ হ'লে যে বিপদ! তৃতীয়তঃ, অভিধান খুল্‌লেই দেখি, আমি কিছুই জানি নে। দু'পৃষ্ঠায় এক ঝাঁক শব্দের মধ্যে দু'টা শব্দও জানা না হ'লে কিরূপ যে কান্না আসে, কে বুঝ্‌বে ? এতে আমার অসহ্য আত্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে—যে মিথ্যা ধারণার উপর নির্ভর করে

চলেছি, তা'ও ভেঙে যায় দেখে, আমি মিথ্যাকেই সত্য বলে মেনে নিতাম। মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নে'য়ার প্রবৃত্তি কারো কম নয়। তা না হ'লে, স্বর্গের কল্পনা মানুষের মনকে এত বিভ্রত করতো না।

অভিধান-দেখার আর একটি বিশেষ দোষ আছে। এতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কমে। একজন বিখ্যাত লোক বলেছেন, আত্ম-বিশ্বাস না থাকলে উন্নত হওয়া যায় না। কোথাকার কে লিখেছে, তাই মেনে নিতে হ'লে আত্ম-বিশ্বাস কমে, নিজের স্বকীয়তা সম্বন্ধে আস্থা থাকে না। কাজেই, যারা অভিধান বেশি দেখেন, তাদের ব্যক্তিত্বই নেই। তবে, একথা আমি বলি নে, যাদের ব্যক্তিত্ব নেই, তারা সবাই অভিধান-ভক্ত।

অভিধান আমাদের ভারি মুস্কিলে ফেলে। একটা শব্দের এতগুলো মানে দেওয়া মানে, পাগল করে তোলা। আর সে-ও কী অদ্ভুত—এমন সব বিরোধী অর্থ। এই ধরুন *Down* অর্থ তুলাও হতে পারে, নীচেও হতে পারে। *Light* অর্থ আলোও হয়, চঞ্চলাও হয়। কী ফ্যাসাদ—কোথায় বা আলো, আর কোথায় বা চঞ্চলা! আমার মনে হয়, অভিধান-লেখক নিজেই কোন্ অর্থ হবে জানেন না, তাই সবগুলো জড়ো করে দিয়েছেন। গ্রন্থকার নিজেও ডুবেছেন, আমাদেরও ডুবিয়েছেন—একেবারে সখাদ সলিলে।

অভিধান দেখে যে লাভ হয় না, তার একটা জ্বলন্ত প্রমাণ আমার নিজের জীবনেই আছে। উঃ—যা' বিপদে পড়েছিলাম! অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ পড়তে গিয়ে দেখি, বিষয়-বস্তুর নামই বুঝি নে। নামটা ছিলো—'FULKA LUCHI'। ফাল্কা লাচি?—ফিউলকা লিউছি?—না, ফুল্ক লুচাই?—কিছুতেই অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে, Chambers, Oxford, Webster এমন কি Dictionary of Slang, Latin Dictionary, D.N.B.,

Encyclopaedia Britannica পর্য্যন্ত উল্‌টিয়ে গেলাম। হতাশ হয়ে প্রবন্ধটিই আবার পড়তে শুরু করলাম। প্রবন্ধের শেষের দিক্‌টায় দেখি, অর্থ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। শব্দটি ইংরেজীও নয়, ল্যাটিনও নয়—নেহাৎ আমাদের স্বদেশী, একেবারে 'indigenous, unrefined' এবং তার অর্থ সেই জিনিস, যার সদ্ব্যবহার করতে আমাদের অরুচি হয় না। সেদিন মনে হ'ল, অভিধান-দেখা নিষ্প্রয়োজন—কারণ, সব কথা অভিধানে থাকেনা।

ভাষাবিজ্ঞানীর মতো শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে আমি শব্দ-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে পারিনে বটে, তবে, অভিধানে শব্দের যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থাকে, শব্দ-যাত্রীদের যে অভিব্যক্তির ইতিহাস থাকে, তা আমাকে বিশেষ আনন্দ দেয়। যে-শব্দটি বিবর্ত্তনের ধারা বেয়ে, বর্ত্তমান যুগে চলে এসেছে, তার সঙ্গে যেন হাজার বছর আগেকার মানুষের গন্ধ ভেসে আসে। কোথাও খণ্ডিত, কোথাও যোজিত, কোথাও লুপ্ত হ'য়ে খণ্ড খণ্ড উপলখণ্ডের মতো এরা ভাষার তীর বেয়ে নব-জীবন লাভ করছে—এদের ইতিহাস আমার সত্যি ভালো লাগে। এ শব্দগুলি কত উদার, কত মহৎ। দধীচির মতো আত্মদান করে এরা আত্ম-সম্বিৎ খুঁজে পায়, মরণের সিংহদ্বার পার হয়ে এরা নব-জনমের সন্ধানে চলে। এদের এ নিরুদ্দেশ-যাত্রা যে কত অন্তহীন ইশারার দিকে, তা ভেবেই আকুল হই। কতকগুলো শব্দ সহসা অন্যদেশ থেকে এসে, নিজেদের কেমন খাপ খাইয়ে নিয়েছে—যেন এ-দেশেরই এরা। এরা ভারি মিশুক, ভারি সামাজিক। বন্ধুত্ব করবার শক্তি এদের অপরিমিত। কতক-গুলো শব্দ ভারি বেয়াড়া—লীলা উচ্ছল ভাষা-স্রোতে এরা টং ক'রে শব্দ করে ওঠে—যেন বলে, আমরা এ দেশের নই, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি অন্য রকমের। এরা বাড়তে জানে না,

টিক্‌তে জানে। এরা রক্ষণশীল সম্প্রদায়। এদের অতীত আছে, দম্ভ আছে,—এরা সঞ্চয়, প্রবাহ নয়। কতকগুলো শব্দ আবার ভারি মিশ্‌তে চায়, হ'তে চায়, বাড়তে চায়। শব্দের জগতে এ জিনিষটি আমাকে মুগ্ধ করে।

হাঁ, তবে একটি কথা—অভিধান পড়লেই ভাষা আয়ত্ত হয়, এ-কথা বিশ্বাস করি নে। বরং এইটেই দেখা যায়, যারা বেশি অভিধানভক্ত, তাঁরা অনেক সময় কাঁচা লেখেন। কারণ আর কিছুই নয়—তাঁরা ব্যষ্টিকে জানেন, সমষ্টিকে জানেন না। তাঁরা জলকে চেনেন দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন রূপে—কিন্তু জল যে 'জীবন', তা তাঁরা বোঝেন না। যাঁরা সাহিত্যের সহজ গতিকে অনুসরণ করেন, তাঁরা পদান্বয়-নির্দ্ধারণে অক্ষম হতে পারেন, বাক্য-বিশ্লেষণে অনেক শিক্ষকের কাছে পরাভূত হতে পারেন, কিন্তু তাদের ভাষা ভাবের নিখুঁত বাণী-বিগ্রহ। তাঁদের ভাষা ঝর্ণার মতো ছোটে, ফুলের মতো ফোটে, তারার মতো জ্বলে, প্রেমের মতো বলে, মেঘের মতো কাঁদে, আবার শিশুর মতো হাসে।

আর এক কথা। আমরা তো আর শব্দকোষ বা শব্দকল্পদ্রুম নই? শব্দ জান্‌লেই যে ভাষায় তা' প্রয়োগ করা যায় না, এ অতি নিষ্ঠুর সত্য। সেক্স্‌পীয়র মাত্র ১৫০০০টি এবং মিল্টন ৮০০০টি শব্দের সাহায্যে কত কথাই না বলেছেন। আমারও মনে হয়, সাগরে প্রয়োজন নেই, এক গ্লাস পানীয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তাই, চার খণ্ড অক্সফোড ডিক্সনারী না পড়লেও আমার আপশোষ্‌ নেই—সে সময়ে একখানা সেক্স্‌পীয়র বা রবীন্দ্রনাথ আমার বেঁচে থাক্‌। তারপর, এইটেও দেখেছি, শব্দ দিয়ে গভীর কথা আমরা বল্‌তে পারিনে। মন যত গভীর, কথা যত ভিতরের, ভাষা তত

অপ্রয়োজনীয়। তখন আমরা শব্দে বলি নে, বলি ভাবে। সবাই যেখানে বলে, কোন কথা হয় নি, আমি বলি হয়েছে, কেউ পড়তে পারে নি। এ-লেখা ভাষায় নয়, কালিতে নয়—এ ভাষার অতীত, এ আলোর অক্ষর, ইঙ্গিতের ধ্বনি, এ অভিধানে থাকে না। এ-ভাষা পড়তে হয় মনে মনে, বুঝ্‌তে হয় দু'জনে। Dr. Johnson এর অর্থ জানেন না, Oxford Dictionary এ আবিষ্কার করতে পারে না, জ্ঞানেন্দ্রমোহন বা রাজশেখর পর্য্যন্ত এখানে মৌন—সুতরাং, থাক্‌

পথের নেশা

পথের নেশায় বের হয়ে যারা বেকনের কথামত চলেন, তাঁদের জ্ঞানের তারিফ করতেই হয়। ততখানি বুদ্ধি খরচ করে কাজ করাটা আমার কুলোয়না বলেও নিজেকে আমি কোনোদিন ধিক্কার দিই নি। জ্ঞান-পিপাসার অভিশাপ থেকে অনুভূতির আনন্দটুকু আমার বেশি ভালো লাগে। আমার মনে হয়, ভ্রমণ ব্যাপারটি বনে না হয়ে, মনেও হতে পারে। যদুগোপালের 'নবীন ভাবুকের' মতো বিগতবৈভব চিতোরে না গিয়েও তার সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে। মিথ্যা কথা— কে বলে, কোনোখানে গেলেই তাকে ভালো করে দেখা যায়, জানা যায়? সমুদ্র যখন দেখি নি, ভাবতাম, না জানি সে কত বড়ো। ঝর্ণা যখন দেখি নি, মনে হ'তো, কী ভীষণ সুন্দর হবে হয় তো!

জীবনে আমি সবচেয়ে বেশি নিরাশ হয়ে গেছি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে। সুদূর-বিসর্পী ফেন-উচ্ছ্বসিত বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমার মনে হ'তো, সমুদ্র আরো সীমাহীন, আরো অথই হওয়া উচিত ছিলো। বেদ যাকে আদি বলে আখ্যায়িত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ যাকে রজ্জুবদ্ধ সিংহ-শিশু বলেছেন, বায়রন্ যার কেশর ধরে খেলা করতেন, সে এত ছোটো? জানি, সত্যিকারের সমুদ্র সত্যি বড়ো—তবু, মন দিয়ে দেখ্‌লে সে যে ছোটো হয়ে আসে। সহস্র তরঙ্গ-ভঙ্গ যখন অনন্তনাগের ফণা নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে, আর জলকণা রামধনু-রঞ্জিত হয়ে খান্‌খান্ হয়ে আছ্‌ড়ে পড়ে, ঠিক্‌রে পড়ে, ভেঙ্গে পড়ে, মূর্চ্ছা যায়, তখন মনে হয়—এ সুন্দর, অদ্ভুত, যদিও অনভিগম্য নয়। ঝর্ণার কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে অবিরল ক্রন্দন, আত্ম-মুক্তির যে প্রেরণা, তা দেখে তাক্ লেগেছে,

দুঃখ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি, পাহাড়ের অতল গহ্বর দেখে। কী ভীষণ, মৃত্যুর মতো স্তব্ধ, নিয়তির মতো অবধারিত। কিন্তু যখন দেখি, এরই উপর জীবন আবার ফুলে ফুলে দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে সবুজ হয়ে উঠেছে, তখন মনে হয়, কী অদ্ভুত প্রহসন! যার পরিণতি এত ভীষণ, তারও আবার উল্লাস!

আমি একা কখনো বের হতে চাইনে। আমার সঙ্গে একজন মনের মতো বন্ধু চাই। প্রকৃতির মধ্যে গেলেই সাহচর্য্য পাওয়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি নে। সাহচর্য্য তৈরী করতে হয়, বরং বলি, এটি সহসা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। তোড়জোড় করে আয়োজন করে স্বাস্থ্যলাভে বিদেশ ভ্রমণে আনন্দ নেই—প্রযোজন সৌন্দর্য্যের হানি করে। ভুবনেশ্বরে নাক্স্‌ভমিকা গাছের বাতাসে শরীর পুষ্ট হয়েছে কিনা ভাব্‌তে শুরু করলে, মহাত্মা হ্যানিম্যান্ এসেও কিছু করতে পারবেন না। কিছু-না-ভাবার প্রবৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে গেলে, শীর্ণতোয়া স্রোতস্বিনীই অসীম নীলাম্বুধি হয়ে কাছে আসে, পেলাগাছই নাক্স্‌ভমিকা হয়ে ওঠে—আর, ঝাউগাছই পাইনের বাতাস বয়ে আনে। অনেকে বলেন, দ্রব্যগুণ বলে একটা জিনিস আছে। হয়তো আছে, কিন্তু মনের গুণ বলে, তা'র বাড়া আর একটা কথা আছে। এর কৃপায়ই আমি অপরিচিত স্থানের মধ্যে পরিচিতের সৌরভ খুঁজি। সব সময় পাওয়া যায় না একে—তবু, তবু এর সন্ধানী হওয়া চাই। যে-জায়গা দিয়ে চল্‌ছি, তাকে আমার বলে মনে করা চাই। তখন দেখা যায়, এ আলো, এ বাতাস, এ মাটি যেন কত অসম্ভব ঐশ্বর্য্যে মহীয়ান। এ অনুভূতি ছেলেভুলানো নয় এর মধ্যে পরম আত্ম-বিলুপ্তি আছে। বিশ্ব-প্রকৃতি তখন সুরভির মতো এসে স্পর্শ করে। এর পেছনে নিঃস্ব-হয়ে-যাওয়া আছে।

তাই, পথের নেশায় আমি কিছু পেতে যাই নে, নিজেকে বার বার হারাতেই যাই। নিজেকে হারিয়ে দিই, ঐ সূর্য্যাস্তের গৈরিকে, ঐ সবুজ মাঠে আঁকা সাদা পথে, ঐ সদ্যস্নাতা লতাবীথিকায়, আর ঐ মেঘ মেদুর আকাশে। আমার সঙ্গে যে থাক্‌বে, সে-ও তেমনি হওয়া চাই। সে যেন বোঝে, কী গভীর এ হারানো। এটুকু যদি সে করতে না পারে, তবেই তাকে নিয়ে বিপদ। আমি তার সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই নে—তার চোখে দেখতে চাই, তার হারানোর আলো এ আমার দৃষ্টি-প্রদীপ। কারণ, আমার মনে হয়, একা-আমি দেখ্‌তে পারি নে, বুঝ্‌তে পারি নে। তাই, যা দেখি, তা তার অনুভূতির পরশ-পাথরে যাচাই করি। কারণ, এখানে বিচারের পরিণতি বিরোধ। আমি চাই, গলে-যাওয়া মরে-যাওয়া, আর, এরই মধ্যে বেঁচে-থাকা।

আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে হারাতে হ'লে একটু নিভৃতি চাই, ভিড়ের মধ্যে সৌন্দর্য্য আস্‌তে পারে না—সে ভারি লাজুক। সে কথা বলে, শব্দে নয়, ইঙ্গিতে। তাই, সন্ধ্যার আঁচলখানি যখন পৃথিবীকে জড়িয়ে দেয়, তখনি আমার কাছে প্রশস্ত সময়। চুপ করে বেরিয়ে-পড়া কাউকে বল্‌তে নেই, সাথীটিকে পর্য্যন্ত না, হাঁ হ'লেই সব মাটি। থাম্‌বো কোথায় জানি নে, বস্‌বো কোথায় ভাবি নি,—চল্‌বো শুধু, এটুকুই জানি। বেশি দূর গেলেই আমার মনে হয়, আর চলা যায় না—একটা গাড়ী দরকার। গাড়োয়ান যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে আমি কোথায় যাব, তা জিজ্ঞেস না-করাই তার পক্ষে (আমার পক্ষেও) উত্তম। সে মাত্র দু'মাইল বেগে চল্‌বে। আমি চাই গতির আনন্দ। চলুক, চল্‌ছে, আরো চলুক। স্থিতি-শীল জীবনের মোহ কাটিয়ে ওঠার পক্ষে এ বেশ। এ জন্যেই বোধ হয় ছন্নছাড়া শ্রীকান্তকে

আমার ভালো লাগে। অন্ধকার রাতে নীলে নীল আকাশের নীচে বসে তারা গুণি। এক মুহূর্তে আমি যেন শত যোজন ভ্রমণ ক'রে আসি, সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে বৃশ্চিকমণ্ডলী দেখে আসি অন্ধকারের কালো জলে এতগুলো সোনার কমল ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে— ঐ আলোতে 'নিজেরে চিনি।'

'পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল' হতে পাতাটি আমি বিচ্ছিন্ন করে পেতে চাই নে। বিশ্লেষণের চেয়ে সমগ্রতাকেই আমি বেশি ভালোবাসি। ন্যাড়া-সিজের কাঁটা দেখে তাকে প্রত্যাখ্যান আমি করি নে। সবুজের মাঠ অগ্রহায়ণে যখন বিচালি-শোভিত হয়ে মনমরা হয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যে নবাঙ্কুর-সূচনাই আমাকে মুগ্ধ করে। সজ্‌নে গাছ যেখানে চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, তার পাশে বটগাছ যদি নিঃস্ব গৌরবেও দাঁড়িয়ে থাকে, তাতেও আমার ক্ষতি নেই। কোনো বাগানের পাশ দিয়ে যেতে রজনীগন্ধার সঙ্গে জুঁইয়ের পার্থক্য করে কাউকে এতটুকু ব্যথা দিই নে। তবে, আমার বিশেষ দুর্ব্বলতা, একটি ফুলের জন্যে, তার কাছে আত্মদান না করে পা'রি নে' অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি, বিরাট পুষ্প-পর্য্যাপ্তির দিকে। তারপর, বয়ে চলি, তাল-গাছটা যেখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, লাউগাছের মাচার পাশে যেখানে তাজা-রক্ত ভরা পুঁই লতা বেয়ে ওঠে।

পথ চলি, আর মনে হয়, যা কিছু দেখি, সবই তো দু'দিনের। চিরন্তন বলে কি এ-নেশায় কিছু নেই? কত প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসে তারপব, চোখে পড়ে, শুধু অনাদি সবুজের রেখা— যে মৃত্যুর মধ্যে স্থির, চপলতার মধ্যে অচপল। ইচ্ছে করে, এর সঙ্গে মিশে যাই, পাবি নে এমন অবুঝ সবুজ ধাবায় যদি এক হওয়া যায়, তবে আর কি? এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ পরম সঙ্গতির মধ্যে যদি আত্ম-সমর্পণ করতে পারতাম!

রবিবার

সপ্তাহের সাতটি দিন মৌমাছির মতো ব্যস্ততা নিয়েও কাটাইনে, আবার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের নিদারুণ অমার্জ্জনীয়তাকে প্রত্যাখানও করি নে। এ জন্যেই, দিনগুলি আমার স্বাধীন ইচ্ছাকে কম-বেশি আহত করে। এদের আঘাতকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো শ্রদ্ধা দিয়ে এখনো নিতে পারি নি। কারণ, ক্ষ্যাপাদেবতা দিগম্বরকে আমি শ্রদ্ধা করি। নিয়মের মধ্যে একটু অনিয়ম না হ'লে আমার যেন পোষায়না। রবিবারটি আমার অনিয়মের নিয়ম-দিন।

সোমবারকে আমি Charles Lamb-এর মতো কঙ্কাল বলেই মনে করি। মঙ্গলের সমর-নিপুণতা আমার নেই—এ জন্যে, অনেক সময় তার সঙ্গে আমার খাপ খায় না। বুধবার খুব নিরীহ, তার বুদ্ধি-মত্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

বৃহস্পতিবারের বারবেলা স্মরণ করে আমি শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়ি—মনে হয়, আজ না-মরলে বাঁচি। আবার, নিজের জন্ম-বার স্মরণ করে খনার বচনে আশ্বাস পাই। শুক্রবার নামের কোন সার্থকতা এখনো বুঝি নি। যে অদৃশ্য অতনু দেবতা এ দিনটির উপর ছড়ি ঘুরান, তার কথা মনে হ'লে, আমার মনে পড়ে—থাক্, অনেক কিছুই মনে পড়ে। হাঁ, মনে পড়ে, সেক্স্‌পীয়রের সেই চরিত্রটির কথা, যে এরই প্রভাবে অ-সুন্দর বল্‌তে শিখেছিলো। শনিবার এলে আমি রীতিমত সাবধান হয়ে পড়ি। মনে পড়ে, শ্রীবৎসের কথা। উঃ, এমনি পরপীড়ন করা যার স্বভাব, তাকে নিয়ে মুশ্‌কিল। আরো বিপদ, সে আসে পেছন থেকে। তাই, মুখোমুখি তাকে কথা শুনানো যায় না—সে গোপনে থেকে কিছু না-বলে, সর্ব্বনাশ করে।

শনির শেষটুকু কিন্তু আমার বেশ লাগে। এ সময়ে আনন্দের পূর্ব্বাভাষ আছে এ আসে বিপাকের রজনীশেষে 'শুকতারা সম'। তার নূপুরধ্বনি, তার মোহন বাঁশী বনে না বাজুক, জনে না বাজুক, আমার মনে বাজে। নিশীথ নিভৃতির মধ্যে আমি সুতীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে তার জন্যে প্রতীক্ষা করি—বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার মতো তার জন্যে আয়োজন করি। আমার হৃদয় দুরু-দুরু করে ওঠে। আশায় মন নেচে উঠে, আবার নিরাশায় মথিত হয়ে পড়ে। আমার ব্যথার পূজা হয়না সমাপন—কই কোথায়, তবে কি আমার চির-ইপ্সীত রূপ মাধুর্য্য কমলাকান্তের মা'র মতো চিরতরে ডুবে গেল? সহসা—

বেলি অসকালে, দেখিনু যে ভালে,
পথেতে যাইতে সে।

তারপরই রবিবার—সূর্য্যের মতো ভাস্বর, জ্ঞানের মতো দীপ্ত, কান্ত, স্নিগ্ধ ও সমাহিত। বিপুল আনন্দে এর কাছে কত কথা বল্‌বো বলে ভাবি, কিন্তু, যা বল্‌তে চাই, তাই ভুলে যাই। শুধু চেয়ে থাকি, মিরান্দার বিস্ময়-দৃষ্টিতে। হাঁ, একটি কথা। সবাই বল্‌বেন, একটি দিন বই তো নয়? সত্যি কথা। কিন্তু, একটি দিন বলেই কি তুচ্ছ? একটি মুহূর্ত্তই কম কিসে? বটবৃক্ষের আয়ু নিয়ে জন্মানোর চেয়ে, একটি দিনের সূর্য্যমুখীর জীবন আমার কাছে শতগুণে শ্রেয়ঃ। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক তো একটি রাত্রিকে জীবনের পরম ঐশ্বর্য্য বলে পেয়েছিলো।

কী অপূর্ব্ব এ দিনটি! এ সবাইর সঙ্গে আছে, অথচ বিচ্ছিন্ন—এ যেন ঘোলের উপরে থেকেও, এর ননীত্বটুকু অনাহত রেখেছে। এ যখন আসে, মনে হয়, এ অসীম অশেষ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, এর পরই আবার—থাক্, সে বারটির কথা। সপ্তাহের মধ্যে এ যে-টুকু অবসর সৃষ্টি করে, তার মূল্য কম নয়। এ দিনে আমার

সময়ানুবর্ত্তিতার জন্যে এত কড়াকড়ি নেই—একটি দিনের জন্য আমার পায়ে পায়ে শৃঙ্খল বাজে না। ইচ্ছা হয়, বেলা বারোটায় প্রাতরাশ সমাধা করে ছন্নছাড়ার মতো বেরিয়ে পড়ি। সমস্ত বন্ধন ও কার্য্য-সূচী থেকে মনটাকে এমন ভাবে মুক্ত করবার সুযোগ কোনো দিনে নেই। অন্য দিনগুলি শুধু আমার কাছে চায়, এ আমাকে দেয়।

তাই মনে হয়, রবিবারটি মহত্ত্বের প্রতীক। এ যেন দিতে পারলেই বাঁচে—এ প্রতিদান চায়না। এ আকাশের মতো উদার, শিবের মতো রিক্ত।

রবিবার মন ও দেহ দুটিরই পুষ্টি-সাধন করে। দেহের সুস্থতার জন্যে নিদ্রাই একমাত্র ঔষধ, এ আমি ডাক্তার না হয়েও বুঝি। তাই মনে হয়, ঘুমানোর জন্যে রবিবার বিশেষ প্রশস্ত। বেশ্ লাগে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, একখানা বাজে বই নিয়ে শুয়ে পড়তে। পড়তে যাওয়াটা একটা অজুহাত মাত্র—উদ্দেশ্য, পড়তে না-যাওয়া। দু' এক মিনিট পর কখন যে চট্ করে বই খাতা ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, খেয়াল থাকেনা। ক্রমে বেশ একটি স্নিগ্ধ অবশতায় শরীরটি মেদুর হয়ে ওঠে। তারপর, চোখ না-মেল্‌তে পারার কী অসীম আনন্দ। নয়?

সব চেয়ে বিরক্তির কারণ হয়, সুখ-নিদ্রার মধ্যে যদি কেউ এসে ডাকে। কেন ডাক্‌বে? এদের কি যমও চেনেন না? এরা এত পরশ্রীকাতর কী করে হয়? তেমন কিছু তো নয়, কারো পাকা ধানে মই-ও দিই নি। তবে, কেন এরা সবাই, এ দিনটিতে, এত ষড়যন্ত্র করে আমায় ডাকে? কী বিপদ! আমি যদি, এই বেশি নয়, অন্ততঃ সাতটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে বেশ্ ঝরঝরে মনে করি, কার ক্ষতি? উঠে মনে হয়, একটু ক্ষণের জন্যে তো 'ব্যাধি মন্দিরম্'

সুস্থ ছিলো। মনেরও যথেষ্ট উপকার হয় এতে। সোমরস পান করে দেবগণও বোধহয় এতখানি শক্তি সঞ্চয় করতে পারতেন না। তাই, অনর্থক 'ফস্ফলেসিথিন্, 'নার্ভ ভিগর্' বা 'মৃত-সঞ্জীবনী' খেয়ে দুকুল হারানোর চেয়ে একটু রবিবার মধ্যাহ্নের ব্যবস্থা করা উচিত।

আর এক কথা। এ দিনটি মিলনের, অন্য দিনগুলি বিরহের। অন্যান্য দিনগুলি আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে, যাকে পেতে চাই, তাকে পাইনে। রবিবারটি পরম বন্ধু। ব্যবধানের দূরত্ব এ কমিয়ে দেয়, কাছে থেকেও নির্ব্বাসনের সে সুকঠিন পীড়া, তাকে প্রশমিত করে। এ মিলনের সেতু—এ অভিন্ন করে, অন্য সবাই ভিন্ন করে। এর দেখে সুখ, ওদের পৃথক করে সুখ। বিচারের চেয়ে এর মন বেশি, ওদের বিচার বেশি। এ যা মন দিয়ে পায়, সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগে তা কার্য্যে পরিণত করে। এর কর-রেখায় বোধ হয়, *Head* ও *Heart Line* এক হয়ে গেছে।

রবিবারের বিকালটি ভারি করুণ। যে এত আনন্দ দিয়েছিলো, সে যে চোখের জলে বিদায় নেবে, ভাব্‌তেও পারি নি। তার যে চকিত-বিকাশটিকে এমন করে পেয়েছি, সে যে এত নশ্বর, তখন বুঝি নি। তাকে বিদায় দিতে কিন্তু মন চায় না। ভুল ভাঙ্গে, মনে হয়, সে যে বাইরের, তাকে ভিতরের কর যায় না। সে গতিশীল, আমি স্থিতিশীল। সব বুঝি, তবু বুঝি নে কেন সে পলাতকা, কেন সে ধরা দেয় না—এ যে শেলীর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী চেয়েও অ-ধর, অ-রূপ। বলি, 'যেতে নাহি দিব', তবু 'যেতে দিতে হয়'।

বর্ষার দিন

যখনকার যা, তা না হ'লেই অদ্ভুত ঠেকে। তাই, শরৎকালের মেঘাবৃত আকাশকে আমি স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিনে—খনার বচন স্মরণ করে আমার আতঙ্ক হয় বর্ষার মেঘলা দিন—হাঁ, এটি মানায় খুব, যেমন মানায়, মায়ের কোলে শিশুটি।

সারাদিন আকাশ গুমট করে অভিমানিনীর মতো বসে থাকলে, ভারি বিপদের কথা। এ যেন কেমন—আদর করলে শোনেনা, কথা বল্‌লে উত্তর দেয়না—অথচ, কৃত্রিম ক্রোধ দেখায়। কতকগুলো বৃষ্টির দিন ভারি বেশী অলস। এ যেন কাটেনা। বৃষ্টির ভঙ্গিই এমন যে, আর ছাড়বেনা যেন! সহসা বের হওয়ার অবকাশ আসে। একটু যেতেই ঈর্ষ্যান্বিত হযে আবার বৃষ্টি নামে, হয়তো বলে, 'চল্‌ নামি', আর কথা নেই।

বৃষ্টির দিনে এ কথাটাই একান্ত করে আমাদের মনে হয় আমরা যেন কত উপায়হীন, কত নিঃস্ব, কত আপন-হারা। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে যাই, দেখি, কী অসহ আর্ত্তনাদ। যা আছি, তা'ও যে সত্যি নয়, এইটে আবিষ্কারের ফলে আমরা আরো নুয়ে পড়ি। নিজের মনটুকু পর্য্যন্ত নিজের অধিকারে রাখা যায়না, এমনি বিপদ। আষাঢ়ের কালো মেঘে কোন্‌ বেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে, আবার বিদ্যুৎ-বিকাশে যেন কার শঙ্কা-নির্দ্দেশ। সহসা মনে হয়—

শূন্য মন্দির মোর!

অনেকে বলেন, বর্ষার দিনে কবিতা লেখা যায়। কবিতা-লেখা? অসম্ভব। শরৎচন্দ্রের মতো লোক সাধ্য সাধনা ক'রে 'ক্রীড়ার' সঙ্গে 'ব্রীড়া' ছাড়া মিল দিতে পারেন নি—আমি পারবো? রবীন্দ্রনাথ

তো পারেন—'তবে কেন পারিব না?' বিশেষতঃ, কবিতা-না-লেখাটা যেখানে অস্বাভাবিক, যেখানে প্রায় প্রত্যেক ছেলে-মেয়েই (আদমসুমারীর মতে যারা শিক্ষিত) কিছু-না কিছু লিখে সুটকেসে রাখে, বিশেষ কাউকে হয়তো দেখায়ও, সেখানে, আমার দল-ছাড়া হয়ে পড়ায় গৌরব নেই। তাই, চেষ্টা করি, লিখি। তারপর, নাই বা মিল্‌লো ছন্দ, তাতেই বা কী? কেন, যুদ্ধোত্তর যুগে কত কবি যে ছন্দোহীন কবিতা লিখেছেন। তাদের অনুকরণ করে চেষ্টা করতে আপত্তি কি? হাঁ, কল্পনার বাষ্পোচ্ছ্বাস চাই, আর চাই নূতনত্ব। সবাই যা বলে, বল্‌বোনা। পংক্তির মধ্যে ডট্ ডট্ থাকবে—ও একটা অসীমের ইঙ্গিত, পাঠক বুঝে নেবেন। (সত্যিতো, লেখক-ই যে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তা আমি মনে করি নে)। তাই লিখি—

'আকাশ……
মেঘের কালো ছায়া পড়েছে জলে।
যেন কচ্ছপের পিঠ।
সব কালো, মৃত্যুর চেয়ে—বিশ্বাস-ঘাতকতার চেয়ে।
জলে ভাসে নৌকা—
ভবতরী……
কর্ণধার-হীন মোর তরী—'

সবইতো আছে এখানে—আকাশ, জল, মেঘ—আর, কী অতি-বাস্তব তুলনা—'কচ্ছপের পিঠ'! তারপর, নৌকা, যা দিয়ে পরপারে যেতে হবে। বেদনার কী নিঃসহায় সুর। আর চাই কি? হয়নি? থাক্ তবে।

বর্ষার দিনে আমার ভয়ের কারণ মাত্র একটি। কালিদাসের মতো লোক পর্য্যন্ত এর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাই আরো।

আমার ভয় হয়! ম্যান্‌হোলে পড়েও মানুষ বাঁচে, পাহাড় থেকে পড়েও মানুষ মরে না। কিন্তু, এ নাকি ভীষণ রোগ—এতে চেতন-অচেতন খেয়াল থাকে না, কী বিপদের কথা! এতে নাকি নেহাৎ বোবা ছেলেমেয়ে মুখর হয়ে ওঠে, এবং পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। (জানি নে, যারা প্রাণ পর্য্যন্ত অবহেলা করে এভারেষ্ট যাত্রা করেছিলেন, তাদের এ সুতীব্র কামনার পেছনে এমন কিছু আছে কি না!)

যাক্ সে কথা। বর্ষার একটা জিনিষের কাছে আমার হার মান্‌তে হয়। তার কান্না আমাকে বিব্রত করে তোলে। এমনি চোখের সামনে কাঁদতে ক'জনেই বা পারে? কী যে তার ব্যথা, কী যে তার অভিযোগ, কী যে অভাব, কিছুই সে বলে না—যতই জিজ্ঞেস করি, কেবল যে ঝরঝর করে কাঁদে। কান্নার পেছনে যে বেদনা আছে, তাকে উপহাস করবার মতো নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আমার নেই। কিন্তু, এমনি বোবা হয়ে থাক্‌লে, আমিও যে সইতে পারি নে। রামবধূ ও কামবধূও বুঝি এমন কান্নাটা কাঁদেনি। অশ্রু? হায়, অশ্রু আমি দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে ভালবাসি। কিন্তু এমন অকারণ অশ্রু যে প্রতিকারহীন। একে যে কোন একটা বিশেষ ছাঁচে ঢাল্‌তে পারি নে। এ যে সীতার হাহাকার নয়, এ তো পরিত্যক্তা শকুন্তলার বিলাপধ্বনিও নয়, এ যে শ্রীরাধিকার বেদনা-বহ্নিও নয়। এ যে—

Tears, idle tears, I know not what they mean

কিন্তু 'ধূমজ্যোতিঃ-সলিল-মরুত'ময় মেঘ লোকটি মন্দ নয়। তাই বোধ হয়, কালিদাস তাঁকে বার্ত্তাবহ করে পাঠিয়েছিলেন। মেঘ নিশ্চয়ই সুরসিক—প্রেমিক। (আমি কালিদাসের মেঘের

কথাই বল্‌ছি)। তা' না হ'লে, সেই বেত্রবতী নদীর মুখামৃত, বা উজ্জয়িনীর পুরনারীদের চকিত চাহনি তাহাকে এত আনন্দ দিতে পারে না। যক্ষ-প্রিয়ার উৎকণ্ঠার কথা মনে ক'রে বিস্মিত হই, কী ক'রে তিনি 'হৃদয়নিহিতারম্ভ' সম্ভোগ-আস্বাদনকে এত সত্যি ক'রে পেলেন। একি সত্যি? কালিদাসের যক্ষকে পেলে এ কথাটাই বুঝিয়ে বল্‌তাম। কিন্তু হায়, একাল সেকাল নয়!

নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষের' পর বর্ষারম্ভের কথা বল্‌তে ভরসা পাই নে। টেনিসন্‌ হতে আরম্ভ করে অনেকেই নববর্ষের মোহে আকৃষ্ট হয়েছেন। নতুন কিছুকে গ্রহণ করে আকাশে উঠানো স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। যারা তা করেন, তারা বড়ো হুজুকে। বন্যার জলের মতো কলোচ্ছ্বাসে যারা সকল কিছু ভাসিয়ে নেন, আবার এক মুহূর্ত্তেই স্থির হয়ে পড়েন, তাঁদের আন্তরিকতায় বিসুভিয়সের উৎপাত থাক্‌তে পারে, কিন্তু সৃষ্টি-মাহাত্ম্য নেই। নববর্ষকে যারা পূজা করে, তারা 'নব' বলেই নববর্ষকে গ্রহণ করে। তারা কাচ ও হীরার পার্থক্য বোঝে না। ছেলে-বেলা পড়েছিলাম, নতুন ঘর, নতুন কাপড়—আরো কত কি, নতুনই ভালো। ভাগ্যিস্‌, শাস্ত্রকারগণ নববর্ষের কথা উল্লেখ করেন নি। কেন যে উল্লেখটি পর্য্যন্ত করেন নি, এখন অনেকটা বুঝেছি। দিন কয়েক আগে, ১৩৪৫ সনের একটা নতুন পঞ্জিকা কিনেছি। 'সরস্বতী কবচে'র বিজ্ঞাপন হতে শুরু করে, 'ফ্যাসান্‌ হাউজের' মোড় পার হয়ে, 'হাঁচি টিক্‌টিকির' নিষেধ সত্ত্বেও একেবারে 'চৈত্রসংক্রান্তি' পর্য্যন্ত পড়ে দেখি, এক বর্ণও নতুন নেই। সেই অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা। তেমনি, মঘা নক্ষত্রে যাত্রা নিষেধ, অমুক তিথিতে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ, আবার, বৈশাখের পর জ্যৈষ্ঠের, তারপর আষাঢ়ের আবির্ভাব। রবিবারের পর মঙ্গলবার এক সপ্তাহেও আসে নি। এতেই মনে হলো, একে কী করে নববর্ষ বলি? অন্ধপুত্রের নাম পদ্মলোচন সখ করে রাখা যায় বলে, সত্য বলে তো প্রচার করা চলে না। সত্যি, নামের কোন অর্থ নেই। (এ বিষয়ে পণ্ডিত-প্রবর জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ আমার সঙ্গে একমত)।

৫

নববর্ষকে আমি রবীন্দ্রনাথের মতো উল্লাসভরে গ্রহণ করতে পারি নে। আমার মনে হয়, নববর্ষটি বর্ষের নয়, মনের। মানুষের মন চিরপুরাতন। কোথাও ইহা কেন্দ্রাতিগ, আবার কোথাও কেন্দ্রানুগ। অনেকের মন সত্য কথা শুনলে শিউরে ওঠে, আলো দেখলে চোখ ঢাকে। আবার কতকগুলি মন, 'বনের পাখী'। এ দু'জনের সঙ্গে কোনোদিন মিল হতে পারে না—রবীন্দ্রনাথ যা-ই বলুন। 'খাঁচার পাখী' তার যথাসর্ব্বস্ব ছেড়ে বনের মুক্তি লাভ করতে চায় না, যেহেতু, 'আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ'।

নববর্ষ নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করে, তাদের কৃতজ্ঞতাবোধ কম। অতীতকে তারা অনায়াসে মুছে ফেলে এবং মনে করে, আজ থেকে তাদের নতুন পথ, নতুন মত। বহুদিনে যা পেয়েছি, সহসা পহেলা বৈশাখ তারিখে তাকে ভুলে যাবার জন্যে এত আয়োজনের যে মনোবৃত্তি তা নিষ্ঠার পরিচয় দেয় না।

পহেলা বৈশাখ, পহেলা বলেই, তাকে এত আদর করা সঙ্গত নয়। তাকে আমি চিনিনে, জানিনে—যাকে চিনেছি, দেখেছি, পেয়েছি, সে শুধু অতীত বলেই, তার সঞ্চারও যে মিথ্যে, এ-কথা বলার মতো আত্ম-প্রবঞ্চনা আমার নেই। বিগত দিনে যার সঞ্চার, বর্ত্তমানে তারই বোধন ও প্রতিষ্ঠা, অনাগতে তারই পূজা। সুতরাং হৈ হৈ ক'রে নতুনকে অভিবাদন করতে না-পারার দোষ আমার নয়। দোষ বা গুণ, মনের। কারণ, সে নিজেকে অপমানিত করবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারে নি।

নববর্ষের চেয়ে অতীতের বয়স বেশি, তাই তার অভিজ্ঞতাও বেশি। আমার জীবনে তারই দান বেশি। এ বৃদ্ধকে আমি সম্মান করি, ভালোবাসি—এর পক্ক-কেশের প্রাচুর্য্যকে নয়, এর অফুরন্ত যৌবনকে, এর অনাগত সৃষ্টি-সম্ভাবনাকে।

নববর্ষের মধ্যে ফাঁকি আছে। সে অনেক মিথ্যা প্রলোভন দেখায়। তার মধ্যে আড়ম্বর আছে, দম্ভ আছে। তাকে চঞ্চল বললেও সম্মান করা হয়। ধীর, কান্ত, সমাহিত, স্নিগ্ধ ও মৌন সৌন্দর্য্য তার নেই। সে মারীচের মতো ভণ্ড, চোখে তার বিদ্যুৎ-দীপ্তি, চলনে তার অস্থিরতা—তাই, তাকে বিশ্বাস করা যায়না। সে নিজেও ফাঁকি, দেয়ও মেকি। তার রূপের সঙ্গে তুলনা চলে 'উর্ব্বশীর'। কিন্তু অতীত 'কল্যাণী'। প্রথমটি সুযোগ-বাদী—প্রয়োজন হ'লে নিজের স্বার্থের জন্যে সে আশাতীত নীচ হতে পারে, যা তা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে পারে। দ্বিতীয়টি, মিথ্যা কা'কে বলে জানে না—সে ধ্রুবতারার মতো স্থির। একজন থাকে সবাইর কাছে, আর একজন থাকে আমার কাছে। একজনকে বিশ্বাস করলে বাঁচি নে, আর একজনকে অবিশ্বাস করলে বাঁচি নে। একজন আমার বাইরে, আর একজন আমার অন্তরে। তাই, একজন বলে, 'আমি এসেছি,' আর একজন বলে, 'আমি আছি'।

নববর্ষ কথা দেয়, কিন্তু কথা রাখে না। সে নিয়ে আসে অগণিত আশা, রেখে যায় নিদারুণ দুরাশা। সে বলে, সে সারাবর্ষের ভূমিকা, কিন্তু পরে দেখি, সে অন্যের লেখা ভূমিকা—গ্রন্থকারের সঙ্গে তার চেনা থাকলেও তার মনের কাছ থেকে সে নির্ব্বাসিত।

নববর্ষ ভারী পোষাকী—তাকে আটপৌরে ব্যবহার করা যায় না। সে প্রতিদিনের নয়, অভাবিত মুহূর্ত্তের। সে অনেক চায়, পায়ও, যদিও কিছু মনে-রাখা সে প্রয়োজন বোধ করে না। স্মৃতিশক্তি নেই বলে সে ওজর দেখাতে পারে, কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, সে কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না—প্রাপ্তির মূল্যও বোঝেনা।

নববর্ষের আগমনটুকু আমি প্রশংসা না করে পারি নে। সে বৈশাখের মতো 'ভৈরব রভসে' আসে না। দিনের আলো, তার চোখে সয়না। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নিশুতি রাতে, চুপি চুপি সে আসে। ঈশানের পুঞ্জমেঘে আকাশ ছেয়ে ওঠে, বিদ্যুতের আলোকে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকারীর মতো চমকে উঠি, আবার গেয়ে উঠি,—

"একলি যাওব তুঝ অভিসারে"

বয়স

কুড়ির বেশি বয়স হ'লে সবাই অচলের কোঠায় পৌছায়, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ, কেউ বলেন নি। কিন্তু এ-কথা সত্যি যে, বয়স ভারি উদার। এ সকলকে সমান চোখে দেখে। সকলেই জীবনে একদিন ক'রে তার কৃপায় নিজকে ধন্য মনে করে। যারা এর কৃপা-বর্ষণ উপেক্ষা করে, তাদের অবস্থা, 'শেষ-প্রশ্নে' অনুপ্রবিষ্ট গল্পের নায়িকাটির মতোই সকরুণ হয়ে ওঠে। আমার বল্‌তে এতটুকু সঙ্কোচ নেই, অনেক পক্ককেশ লোকও তরুণের চেয়ে তরুণ। কেন, কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিস্ময়কর তারুণ্য ক'জনের-ই বা আছে? এমন চির-উদ্ভিন্ন সবুজতা বাংলার শ্যামলতায়ও নেই। আর বার্ণার্ড শ হাঁ, ইনি তো বুড়ো হতেই চান না ইনি যেন বয়সের অতীত! এক ভদ্রলোকের কথা শুনেছি,—বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ--তিনি পর্য্যন্ত, (যদিও মৃতদার), বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে পঞ্চমুখ।

ইঁচড় খেতে ভাল লাগ্‌লেও ইঁচড়ে-পাকা ছেলেমেয়ে আমার অসহনীয়। এ যেন কেমন অর্দ্ধ-সিদ্ধ তরকারী -হজমও হয় না, স্বাদও লাগে না। তবে ওরা দুনিয়ার বিস্ময়কর সৃষ্টি। প্রত্যেকটি বিস্ময়কর সৃষ্টির মতোই এরা যেন কার্য্য-কারণহীন। কী করে এরা হ'ল, তা জানবার জন্যে গবেষণার প্রয়োজন নেই— এরা যেন ফুটে উঠেছে, অবাক বিস্ময়ের অদ্ভুত পুষ্প-কোরক রূপে। শার্লি টেম্পল্ বা Dickens-এর আলেক্‌জাণ্ডারের মতো শিশু তাই এত মনোহর। কিন্তু শরৎবাবুর 'নরেন'কে আমি এত ভালোবাসি-- বিশেষ ক'রে, লেখাপড়া নিয়ে ওর কথাবার্ত্তা গুলো।

যুবক হলেই যুবক হয় না, এ কথা বলেছি। বৃদ্ধত্ব চর্চ্চা করে যারা জ্ঞানী আখ্যা পেয়েছেন, তাদের কী করেই বা যুবক বলি?

বহু লোক নাটকে মেয়ের পাঠ করে (কে না জানেন, আমাদের দেশে এলিজাবেথীয় যুগ সবেমাত্র কাট্‌তে আরম্ভ করেছে ?) নারী আখ্যা পেতে চান। তাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে রীতিমত আত্ম-বিস্মরণ আসে। সে কী ন্যাকামি, কী অযথা মিহিমিহি কণ্ঠ-ধ্বনির প্রচেষ্টা, নারীত্ব লাভের কী ব্যর্থ প্রয়াস! পুরুষের এ বিগলিত ভাব আমার কাছে রীতিমত অসহনীয়। বিস্মিত হই, এরা কি জানেনা যে, নারী-সৃষ্টিতে ভগবানের এখনো এতটুকু ক্লান্তি আসে নি? পুরুষ পুরুষ হ'লেই গৌরব, আর নারী নারী না হ'লেই অগৌরব, এ সহজ কথাটি তারা কেন বোঝেন না? যাক্‌, এদের মনের খবর ফ্রয়েড্‌ জানেন।

'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং', (কিন্তু ভোজনে নয়,) এ মহাবাণী মেনে নিয়ে দুনিয়ার সবাইকে যারা বৃদ্ধ তৈরী করতে উৎসুক, তারা কিন্তু একটা প্রকাণ্ড ভুল করেন। ভুলে যান তারা যে, তা হ'লে সৃষ্টি চল্‌বেনা। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় বৃদ্ধদের জন্যে যে ব্যবস্থা করেছেন, তা ভয়াবহ (আমার তো রীতিমত ভয় করে)।

হাঁ, যুবকদের আশা ভরসা সবই আছে। কিন্তু বয়সের পার্থক্য হেতু তারা তো নীলকণ্ঠ হ'তে পারে নি। হয় তো তারা বল্‌বে, তাদের যুগে কত উন্নতি হয়েছে—মানুষ আকাশ জয় করেছে, সাগর পার হ'তেছে, মনের কথা বলে দিতেছে—কত কী! কিন্তু যে-কোনো সুস্থ বয়োবৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেই তাঁর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'তে হি নো দিবসা গতাঃ—'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই!' তাদের সময় কত কী ছিলো। দুধ ঘি মাছ জলের দামে বিক্রী হতো। টাকায় আট মণ চাউল বিক্রী হতো, এ নিয়ে অনেকে গৌরব করেন। 'আর সাহিত্য?—যথেষ্ট ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক হয় নি, হতে পারে না, হেমচন্দ্রের মতো কবি শত

বীন্দ্রনাথেও হবে না, এ সব কি বাজে কথা? একজন সেকেলে পণ্ডিত নাকি ক্লাসে বল্‌তেন, 'রবিবাবুর কবিতায় বোঝাবার কিছু নেই, না আছে সমাস, না আছে সন্ধি—গুটীকয় বিভক্তিঘটিত অশুদ্ধি তাঁর দান বটে!" কবিগুরু তাঁর এ সমালোচনার কী সার্টিফিকেট দিবেন, জানিনে। "আর, তেমন ধরণের শিক্ষা-প্রণালী (হাঁ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এক ভদ্রলোককে বল্‌তে শুনেছি) হয়না—হয়না—হবে না—না—না- না। উঃ, সেই যে ম-, অঙ্ক কষাতেন, যেন মুখস্থ-করা জিনিষ; ক—'র মতো nonstop ইংরাজী তো আজকাল কেউ বল্‌তেই পারে না। বাংলা পড়াতে ব—'র মতো কৃতিত্ব দেখাই যায় না। 'ণ-ত্ব বিধান' ও 'ষ-ত্ব বিধানের' অধ্যায় থেকে আরম্ভ করে 'ক্রিয়াযোগে' চতুর্থী, না 'সম্প্রদানে চতুর্থী', এ সব ব্যাপার তার নখাগ্রে ছিলো। হবে নাই বা কেন? ব্যাকরণটা তিনি মুগ্ধবোধ-প্রণেতার চেয়ে খারাপ জানতেন না। সত্যইতো, কোথায় তেমন পরিশ্রম, কোথায় তেমন অধ্যবসায়?

সে যাই হোক্, বয়স-হওয়া একটা বিরাট ট্র্যাজেডি। এর সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ববোধ এসে পড়ে—যা-খুশি-ভাবটা আর চলেনা। যে যে যাই বলুন, চরমের পথ চেয়ে কেউ কোনো দিন আলোর দেশে যেতে পারে না—এটা যেন একটা কাণা গলি। তাই বয়োবৃদ্ধগণও অতীতকেই লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, আর বর্ত্তমানের বিফলতাকে বয়সের বাড়্‌তির কথা বলে বিজয়ী করে তোলেন। শেষ বয়সে তারা 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছে দেখেন, এটা 'সব হারানোর দেশ'। নবীন-চন্দ্রও আক্ষেপ করতেন, 'নির্ম্মল শৈশব কাল সুখের স্বপন'।

সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে কিন্তু বয়স বাড়িয়ে বলাই সঙ্গত। দু'শ তিন'শ বছরের সাধুদের কাছে কার না মাথা নুয়ে আসে? অল্প বয়স্ক সাধুকে অনেকে (আমার কথা বল্‌ছিনে) শ্রদ্ধা করতে চায় না।

সেদিন, আমার এক বন্ধু, ত--, অদ্ভুত রকমের একটা কাহিনী বল্‌লেন। এক গ্রামে একজন বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর চুল এখন আর ভ্রমর কৃষ্ণ নেই। তিনি নাকি বলেন, বায়ু রোগে তাঁর চুল পেকেছে, বয়স তাঁর অনেক কম। না, ভারি মুশ্‌কিল, কোনো সিদ্ধান্তেই আসা গেল না।

বয়স বেশি হয়েছে, একথা কেউ বল্‌লে, অনেকরই খারাপ লাগে। বয়োবৃদ্ধকে যুবকের চেয়ে যুবক বল্‌লে আর রক্ষা নেই—কি করে তিনি এ অটুট স্বাস্থ্য রক্ষা করেছেন, সে মহাভারত তিনি আপনাকে শুনিয়ে দেবেনই। বয়স কমিয়ে বলে কাউকে আপনি খুশি করতে পারেন নি—এ হ'তেই পারে না। অনেকে আবার বিশেষ কারণে বয়স কমিয়ে বলেন---সে মনস্তত্ব একান্ত ব্যক্তি-সাপেক্ষ। আমাকে কেউ যদি বার বার মনে করিয়ে দেয়, এক শতাব্দীর চতুর্থাংশের বেশি বৎসর কাটিয়ে উঠেছি, বেশ লাগে আমার। এতদিন ধরে পৃথিবীতে এসেছি, ভাবতেই ক্লান্তি লাগে। বয়সের কথা ভেবে ভরসা পাই, যাক্ তা হ'লে আর ক'টা বছর, তবেই শেষ। কী আরাম!

শুনে বিস্মিত হয়েছি, সেদিন এইচ্, জি, ওয়েলস্ তাঁর জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে নাকি বলেছেন, 'আমার জয়ন্তী-উৎসব করে, আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিতেছ, আমার আর দিন নেই।' আমি বলি, পৃথিবীকে এত বেশি ভালবাসা ঠিক নয়, শেষে নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় আছে, আর হারালে তো পাওয়া যায় না। একটু দূরে থাকাই ভাল। সবাই যদি এতদিন বাঁচতে চায়, তা হ'লে যারা রোজ রোজ নূতন ক'রে আস্‌ছে, তাদের উপায় কি? পরের দিক্‌টাও ভাব্‌তে তো হয়!

শুয়ে-থাকা

কঠিন কাজই কঠিন, এত বড় মিথ্যে কথাটা কী করে চল্‌তি হ'ল, বুঝ্‌তে পারিনে; বরং, সোজা কাজের চেয়ে কঠিন কাজ যে আর হতেই পারে না। কঠিন কাজের জন্যে আত্ম-পরীক্ষা চলে, উপায়-নির্দ্ধারণ চলে, মীমাংসা চলে। কিন্তু, সোজা কাজ সোজা বলেই কঠিন—তার মধ্যে আবার, শুয়ে-থাকার মতো অত্যন্ত সোজা কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলেই আমার ধারণা।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে কী চেষ্টাই না করেছিলেন! অবশ্য, ঘুমিয়ে পড়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়, ঘুম আসে ভাল, না হয়, শুয়ে-পড়া তো যায়? শুয়ে পড়লেই কিন্তু দেখি, শোয়া হয় নি, মানে, বিশ্রামটি সশ্রম হয়ে ওঠে। কোথাকার কী সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা এসে হাজির হয়। সমস্ত চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই বলেই বুঝি চিন্তাগুলো মাছের ঝাঁকের মতো আসে, যায়, আবার এসে আমায় বিব্রত করে। মনে হয়, এমনি করেই কি জীবন চালাতে হয়? এর অর্থ কি? এ অতি পুরানো কথা—তবু, তবু এ যে নতুন হয়ে আসে। দিনের পর দিন একই ভাবে চলা-ই কি জীবন? তার চেয়ে দুঃসহ লাগে, যখন দেখি, এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই—একেবারে সীমাহীন যাত্রা। এ যাত্রার জন্যে আমার এতটুকু হাত নেই। কে যেন চালায়, কে যেন থামায়, কে যেন বলে, 'এমনি চলো'। জীবন-দেবতা? না, অতি বড়ো কথা। 'টেসের' জীবন যিনি গুঁড়িয়ে দিলেন, 'কুন্দ'কে যিনি ফুটতে দিলেন না, 'দেবদাসের' যিনি বিভুঁই বিদেশে সর্ব্বনাশ করলেন, এ ঠিক তাঁরই খেয়ালের খেলা? কিন্তু, শুয়ে থেকে যদি আমি এতটুকু শান্তি পাই, তাতেও তাঁর বিদ্বেষ কেন? সবই তো তাঁর ইচ্ছামতই চল্‌ছে—রাজ-সম্পদ

নয়, বিরাট কিছু হতে-চাওয়াও নয়, কোনোমতে, শুধু, শুধু শুয়ে থাকো। আর বেশি কিছু নয়!

শুয়ে পড়লে আমার মনে হয় আমার আর ওঠবার শক্তি নেই। সমস্ত জীবলীলা হতে বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে নিজের মধ্যে যেন সংহত করতে চাই। বুঝ্‌তে চাই, মানুষ কত একা! তারপর, ঘরের ঐ কোণে মাকড়সা জাল বুন্‌ছে—দেখি, আর রবার্ট ব্রুসের অধ্যবসায়ের কথা মিথ্যে বলে মনে হয়। দালানের কড়িকাঠ. গুণতে শুরু করি—দশটা কড়িকাঠ উত্তর হতে দক্ষিণে, আবার দক্ষিণ হতে উত্তরে পর্য্যন্ত গুণে যাই। ক্রমেই শরীরটা অবশ হতে অবশতর, হয়ে ওঠে। বালিশটি বুকে চাপা দিয়ে কোনো বইয়ের পাতা উল্টিয়ে যাই। উদ্দেশ্য পড়া নয়—না-পড়া। হঠাৎ একটা পংক্তি চোখে পড়ে, "কাদম্বিনী চলে গেলো"। চলে গেলো? সত্যি? কেন? সত্যি চলে গেলো? কেন, চলে গেলো? কেন? ভারি অন্যায়, না, যেতে পারে না—নিশ্চয়ই যেতে পারে না। কী ছাই বই যা হওয়া উচিত নয়, তাই যে লেখা! না, বই-পড়া হবে না। ভাল, বার্ণার্ড শখানা নেয়া যাক্—কী বিশাল বই, উঃ, এটা যদি কেউ চোখের কাছে খুলে রাখে, আর পাতাটা উল্টিয়ে দেয়, তবে একবার চেষ্টা করা যায়। না, পড়াটাই যে যায় না। বইয়ের গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই—এরা যেন প্রাণহীন 'মামি'। এদের সঙ্গে কথা-বলা চলে না—এদের কথা শোনা চলে। তাই স্থির করেছি, আর বই পড়বো না, এর চেয়ে শুয়ে-থাকা ঢের ঢের ভালো। শুয়ে থাক্‌বো, চুপ করে। আবার, শুয়ে পড়লেই দেখি, সবাই যেন আড়ি করেছে। এদের যেন ইচ্ছে, আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেবে না। একান্ত অসহায় ভাবে আমি কত কিছু ভাব্‌তে চাই—ভাব্‌তে চাই, যা হতে পারিনি—যা হয় না, যা

হতে পারে না। যদি হ'তো? এই যদির কথা নিয়ে আমি কোথায় চলে যাই। বুঝি, 'যদি'-টি যদি সম্ভব হ'তো তবে আমি যা আছি, তা থাকা অসম্ভব হ'তো। ভাবি, আর মনে হয়, সব হয়েছে—সব যে হয় না, এ-কথাটা আমার মনেই হয় না। যা চাই, তা হয় না—কিন্তু এইটে আমি কোনো দিনই ভাবতে চাই নি। মনে পড়ে, এক বন্ধু আমায় একদিন বলেছিলো যে, যা পাই নে, তাই আমরা বেশি করে পাই। আমি বল্লাম, পাই নে, পাই বলে মনে করি। সে বল্লে, মনে-করাটাও একরকম পাওয়া। আমি বল্লাম, 'কেমন?' কেন?—আমি যে ভাবে যা চাই, তা ঠিক তেমনটি করে পেয়েছি বলে ভাবি—আর, ভাবতে ভাবতে দেখি, আমি আর একা নই। ধীরে, অতি ধীরে এ পরম পাওয়াটি আমার সত্য হয়ে ওঠে, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ি।' আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'তা হয় না—এতে আগুন জ্বলে। বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত করে বল্লাম, 'সূতা ছোট করিও'। সহসা কে যেন দরজা ধাক্কা দেয়, বলে, 'আমার প্রাপ্যটা·········'। সে যেতেই আর একজন হঠাৎ গুণ্ গুণ্ করে ঘরে প্রবেশ করে বলে, 'কেমন?' কিছু বলি নে, তবু সে তার অনিন্দিত সুরে আবার গায়, 'যবে গোষ্ঠে চলিলা·········', মনে হয়, এর চেয়ে অত্যাচার আর হতে পারে না। সহসা আর একজন এসে বলে, 'মন খারাপ' (সে ডিকেন্সের Lorry-জাতীয় লোক, কাজেই, তার মন সম্বন্ধে আমি আস্থাহীন)। দু'মিনিট না যেতেই হুকুম আসে, বাজারে যেতে হবে। বাপ্রে, এ-বারই শেষ—'বা—জা—রে? না, পারবো না—পারবো না—পারবো না! আমার শুয়ে-থাকা একান্ত দরকার, আমি শুয়ে থাক্‌বো, উপায় নেই।

তাই বলে, রোগী হয়ে শুয়ে থাক্‌তে কার ভালো লাগে? সামান্য

অসুখ—এই ধরুন, একটু জ্বর, সামান্য একটু পেটের গোলমাল, এ মন্দ নয়। এ এক রূপ বিলাস। শুয়ে আছি, যারা ছ'মাসেও আসে না, তারাও একবার সহানুভূতি জানিয়ে যায়। একেবারে কেউ না এলে কিন্তু ভারি খারাপ লাগে। অসুখ হ'লে, সবাই একটু সমীহ করে চলে—চুপি চুপি ঘরে এসে যথাসম্ভব আদর করতে চায়। যাঁরা গুরুজন, তাঁরা পর্য্যন্ত সে-সময় আমার কথা মেনে চলেন, বন্ধুগণ আমার কত অত্যাচার সানন্দে সহ্য করে। এ-সময় যে সব জিনিস খাওয়া যায়, তা সচরাচর কপালে জোটে না। এমন খাদ্যপ্রাণযুক্ত ফলফলানি কো আর সুস্থ অবস্থায় খাওয়া হয় না? কিন্তু, সব চেয়ে কাম্য হ'ল, এ সময় দেখে-নেওয়া, কে কে আমার কাছে আসে। যারা প্রয়োজনের খাতিরে আমার কাছে একশো বার আস্‌তে পারে, বা আস্‌তো, আজ আমার প্রয়োজনে তারা কোথায়? যাক্, আমার বুঝ্‌তে ভুল হয়েছে আজকের প্রয়োজন আমার নিজের, কাজেই তারা আস্‌তে পারে না। তবু, দয়া করে যারা আসেন, তাদের বড়ো ভালো লাগে। যারা এতখানি আপনার, তাদের আমি কোনোদিন যেন ভুলি নে।

হাসি

স্যাড্‌লার কমিশন যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁরা নাকি বলেছিলেন, 'এ দেশের ছেলেরা হাস্‌তে জানেনা'। বাঙালী সাধারণতঃ হাসিয়ে জাত নয়, তাদের মত কাঁদুনে জাত কম আছে। তবু, তাঁরা নাকি বলেছিলেন যে, ক্ষমতা থাকলে তাঁরা এদেশের ছেলেদের হাস্‌তে শেখাতেন। কিন্তু, হাসি জিনিসটি এত সহজ নয়। যে হাসির পেছনে আন্তরিকতা নেই, তা শুধু লাঞ্ছনা। হাস্‌তে না-পারাটা কত দুর্ভাগ্যের কথা, সবাই তা বোঝে না। অনেকে লঘু নির্ম্মল হাসির অভিব্যক্তিকে অন্যায় মনে করেন। যে ছেলে বা মেয়ে হাসে না (প্রায় কাঁদে !), যে কথা কম কয়, যে বেশি বেশি জীবন-মৃত্যুর আলোচনা করে, তার প্রশংসা লোকমুখে আর ধরে না। 'ধীর' 'গম্ভীর' 'সুশীল' ইত্যাদি জাতীয় বিশেষণ তার জন্য তো মজুত-ই আছে। এক ভদ্রলোকের কথা জানতাম কারো সঙ্গে তিনি মিশতেন না। বাড়ী হতে বেরিয়ে তিনি কার্য্যস্থলে গিয়ে আবার ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরে কোণ-ঠাসা হ'য়ে থাকতেন। রাস্তায় পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে, পাশ কাটিয়ে অপরিচিতের মতো চলে যেতেন। তিনি হাস্‌লেই ভয় হয়। অবশ্য, আর একজনের কথা জানি, সে ডক্টর জন্‌সন্‌কে ছাপিয়ে উঠেছে। সভা-সমিতিতে তার হাসি ছিলো ভূকম্পের মত আতঙ্ক, 'পঞ্চম কন্যা' জন্ম সংবাদের চেয়ে ভীষণতর। তবে তার ফুস্‌ফুস্‌টা যে সবল, একথা অস্বীকার করার কারণ নেই।

কেমন করে কখন হাস্‌তে হবে, তা বলে দে'য়া যায় না। ঠিক সময়ে ঠিক হাসিটি যখন ফুটে ওঠে, মানায় বেশ। সারাদিন ঝড়ের পর বৈকালী আলোর যে হাসি, তা কত মধুর—যেন চোখের জলে

তাতে মুক্তা ঝরে। পরনিন্দা পরকুৎসা কীর্ত্তন করে, সহসা বহু-নিন্দিত ব্যক্তিটির আকস্মিক আগমনে, তাকেই লক্ষ্য করে এক গাল হেসে যারা বল্‌তে পারেন, 'আসুন, আসুন, আপনার কথাই চল্‌ছিলো' তারা কিন্তু বেশ ভদ্রতা জানে! এক জাতীয় হাসি আছে, তার নাম 'অনর্থক হাসি'। এর শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান নেই—দুঃখেও হাসি, সুখেও হাসি, না-বুঝেও হাসি। আর একটু বুদ্ধি থাক্‌লে, এ হাসি হাসা যায় না। 'ব্যবসায়ী হাসিটি' যার জানা নেই, সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তার চলে না। ক্রেতা যখন বিক্রেতাকে বলে, 'না, দাম বড়ো বেশি, বুদ্ধিমান বিক্রেতামাত্রকেই তখন বল্‌তে হয়, 'আপনি ভদ্রলোক, আপনার সঙ্গে কি দর-কষাকষি চলে?' তখন ক্রেতা পর্য্যন্ত আত্ম-প্রাসাদের মৃদু হাসিতে বিক্রেতার শরাহত হ'তে বাধ্য হন।

এমন লোকও আছে, যারা হাসে শুধু কান্না চাপ্‌তে চায় বলে। বেদনার কথা, দৈন্যের কথা মানুষের ব্যক্তিগত। কারণ, আনন্দের মধ্যে আমরা বহুকে পাই, বেদনার নির্জ্জন নিশীথে নিজের আত্মাকে পাই। বেদনার মন্দিরে মানুষ একা পূজারী, সবাই সেখানে অনাহূত। এ-জাতীয় হাসি শুধু আত্ম-বিস্মৃতির জন্যে—এমনটি হাসতেন চার্ল্‌স ল্যাম্ব। মনের ভিতর ছুরি শানিয়ে যারা ঠোঁটের উপর ফুল ফুটিয়ে তোলে, তারা ওস্তাদ লোক। এদের চিনতে না পারলে বিপদেরই কথা।

সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন, 'পশুরা বনে, শিশুরা মাতৃকোলে'। আমার মনে হয়, এর চেয়ে মানায় বেশি, শিশুর প্রতি মায়ের আত্ম-প্রসন্ন-হাসিটুকু। ক'দিন আগে যে শুধু 'ইচ্ছা হয়ে ছিল মনের মাঝারে', সে আজ ভিতর ছেড়ে বাইরে এসে বাসা নিয়েছে। তাকে দেখে নব-প্রসূতির আনন্দ আর ধরে না—এ যেন কার্ত্তিকের মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি। আর একটি হাসি, আকাশের মতো উদার,

আনন্দের মতো সহজ কয়েকটি মহাপুরুষের কথাই আমার মনে পড়ে। এ হাসি দেখেছিলাম, ভগবান বুদ্ধদেবের মুখে,—'করুণার সুধাহাস্য-জ্যোতি'। তেমনি আর এক হাসি দেখেছি, ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে। সমস্তখানি আত্মবোধ যেন সীমাহীন প্রাপ্তির আনন্দে গলে গিয়ে পরম প্রশান্তি লাভ করেছে। এ জিজ্ঞাসার অতীত, কামনার অতীত, তন্ময়তার চরম কান্তি। 'আপন হারায়ে' যাঁরা আপন-তরকে পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষেই এ হাসি সম্ভব। বর্তমান যুগের মহাত্মায় দেখেছি, কী অভাবনীয় হাসি! মুকুরের মতো স্বচ্ছ, শিশুর মতো সরল, নিয়তির মতো অভ্রান্ত, কঠোর দ্বন্দ্বের মধ্যেও দ্বন্দ্বাতীত, বন্ধনের মধ্যেও মুক্ত, ভ্রান্তির মধ্যেও জ্যোতির্ময়। সেক্স্‌পীয়রের মুখে দেখেছি, মানুষ চেনার হাসি। এ যেন হিমাদ্রি-দেহে বরফের শুভ্র-বিস্তারের মতো।

শিশুর হাসির মতো এমন সুন্দর জিনিস আর নেই। ঐ এক টুক্‌রো হাসিতে স্বর্গের মধু জমা হয়ে আছে, ফুলের মতো কোমল, একেবারে খাঁটি সোনা। এর প্রলোভন আছে, পাপ নেই; কামনা আছে, অবশতা নেই; আমন্ত্রণ আছে, বঞ্চনা নেই। এ যেন আলোর কমল—রূপ-ঝলমল।

লোকে বলে, কবিরা জন্মায়, জোর করে কবি হওয়া যায় না। এর চেয়ে গভীর সত্য, জোর করে হাসা যায় না। কাতুকুতু হাসির মধ্যে ব্যায়াম আছে, রসঘনতা নেই। যে হাসিতে সংযম নেই, ভয়ের সামান্য পীড়ন নেই, তা উঁচুদরের জিনিস নয়। প্রেমিকা যখন অবাঞ্ছিত সজাগ দৃষ্টির সামনে সুযোগ বুঝে হেসে নেয়, শুধু একজনের জন্যে, তার মাধুর্য্য অনুপম। তার একদিকে ফাঁকি, আর এক দিকে সাকী। এ যেন নিভৃত কোলাহল, অচঞ্চল চপলতা। এর মধ্যে থাকে মোনালিসার হাসির অস্পষ্ট গোধূলি-

সৌন্দর্য্য। এ বলে কম, বুঝায় বেশি। এরই সঙ্গে নিবিড় হয়ে থাকে, অভিমানের বেদনা—তা'ও আবার টুকরা হাসির ভূমিকা। এ-হাসি আঘাত দিয়ে কাঁদায়, আবার নিজে হাসে। তারপর, কেঁদেই আবার হাসি জাগায়।

বাহুবলে রাজ্য জয় করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু হাসি দিয়ে মানুষকে বশ করা যায়। পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যাদের হাসিটুকুই সব। মানুষের সঙ্গে তারা এক হয়ে গেছে! এ-হাসিটি না হ'লেই ওদের মানায় না—তাদের অন্তরটি যেন অধরে এসে ধরা দিয়েছে। এমন একটি ভদ্রলোককে আমি জানতাম। তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌লেই আমার মনে হতো, আমি যেন উন্নত হয়ে গেছি। কী প্রশান্তি কী সমাহিত সৌম্য ভাব তাঁর হাসিতে! এ ঐশ্বর্য্য তাঁর ছিলো বলেই যেন পৃথিবীতে তাঁর স্থান হয়নি। তাই যে-দেশ হতে মানুষ আর ফিরে আসে না সেখানেই তিনি চলে গেছেন—স্মৃতিভারে পড়ে আছি আমি।

দান করা

সব মানুষ যেমন মানুষ নয়, সব দানও তেমন দান নয়। এবং প্রথমেই বলে রাখছি, যে-দান করলে লোকে দানবীর বা দানসাগর বলে—তার সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌ছি নে। যে-দান চেয়ে পেতে হয়, তা যেমন দান নয়, তেমন, যে-প্রেম জোর করে আদায় করতে হয়, তা প্রেম নয়। চাইতে গেলেই দানের মর্য্যাদা আর থাকে না। চাওয়াটি তো দানের দাম। কিন্তু একে যে মূল্য দিয়ে কেনা যায় না! না-চেয়ে যা পাই, তাই সত্যিকারের দান।

সবাইকে দান করা যায় না। আর, সবাইকে এক জিনিস দিলে দানের কৌলীন্যও বজায় থাকে না। আবার, সব সময় দান করাও যায় না। কোনো কোনো সময় মনে হয়, বিশেষ কাউকে যেন কিছু না দিতে পারলেই আর চলে না। দেওয়ার অর্থ, শুধু তাকে আপনার করে পাওয়া। যেখানে 'এটা দিলে লোকে কি বল্‌বে'—এ প্রশ্ন আসে, সেখানে দান না করাই ভালো। আমার দিতে ইচ্ছে হয়েছে, দেবো। যে গ্রহণ করেছে, সে যদি সোনা বলে মনে না করে, তবে দানের কলঙ্কই বড়ো হয়ে রইলো। অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের নিকট হতে যে দান গ্রহণ করেছিলেন, তেমনটি মুখের কথা নয়। আত্মভোলা না হ'লে এমন মহৎ দান করা যায় না। আসল কথা, যাকে কিছু দিতে হবে, তার চেয়ে আমি ভিন্ন, এ কথা মনে এলে দান না করাই ভাল।

যা দেওয়া হ'লো, তা কেবল গ্রহীতার জন্যে—এইটে যখন সবাইর হয়ে উঠে, তখনই এর অপমান শুরু হয়। কারণ, দেওয়াটি শুধু দু'জনের মধ্যে—একজন আর একজনের কাছ হতে অবাধে অসঙ্কোচে তা গ্রহণ করে। হাঁ, সত্যিকার দান করতে পেরেছিলো 'ললিতা' 'শেখরকে'। এ দানের মধ্যে 'কিন্তু' নেই। জগতের অজ্ঞাতে

যেখানে দু'জন এক হয়ে গেছে, সেখানে দানের যোগসূত্রটি তাদের এক করে তোলে। এমনি করে দানের মোহনায় পরম পাওয়াটি সম্ভব। যেখানে অনুমতি নিয়ে দিতে হয়, সেখানে দানের সুরভি থাকতে পারেনা। একজন যেখানে প্রতীক্ষমান হয়ে, সভয়ে, দুরুদুরু বুকে, অশ্রু-ছলছল মূর্ত্তিতে, একটু এগোয়, আবার পিছোয়, আর একজন অসীম আবেগ-কম্পনে তাকে 'আমারই' বলে গ্রহণ করে, সেখানেই দানের অর্থ হয়। অভিজ্ঞান উপলক্ষ্য হয়ে এসেছিলো, কিন্তু পেছনে পড়ে থাকে, তার কাজ শেষ হয়ে যায়।

কী দেয়া যায়, এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায় না। কোনো বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথের সব বই না দিয়ে, কেবল 'সঞ্চয়িতা' বা 'চয়নিকা' দিলেও চলে। এমন কি 'গীতা' বা 'ওমর খৈয়াম'ও অশোভন হয় না। চমকপ্রদ জিনিসটা যেন কেমন। ওর মধ্যে থাকা চাই, নিরাভরণের আভরণ।

দান করে যদি কেউ মনে করে, সব শেষ করেছি, তবে তার দান পূর্ণ হয় নি—কারণ দান যে মাত্র সূচনা, এর কাল নিরবধি। এ সূচনাকে যদি সে সম্মান করতে না পারে, বুঝতে হবে, আর সব থাকলেও প্রাণ (মন নয়) জিনিসটির উৎপাত তার নেই।

চিঠি-লেখা

চিঠি লেখায় যত আনন্দ, চিঠি পেতে তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। তবে যার তার চিঠিতে আমার মন ওঠেনা। অনেক চিঠি আছে, যা দিয়ে আমার মূল্য যাচাই হয়। পৃথিবী হতে কোনো মানুষ চলে গেলে তার এতটুকু বাঁধেনা, সে নির্ম্মম ভাবেই চল্‌তে থাকে। অথচ, মানুষ এত দুর্ব্বল যে, সে চলে গেলে কেউ কাঁদে কিনা—এ কথাটি জান্‌তে তার কত আগ্রহ। অন্ততঃ, এক ফোঁটা চোখের জল যার ভাগ্যে নেই, সে দুর্ভাগার বাঁচার কোন অর্থই হয়না। আমার মনে হয়, যে-বন্ধু আমার কাছে চিঠি লেখেনা, হঠাৎ ছ'মাসে দেখা হ'লে বলে, তোর জন্য কত যে ভাবি!—তাকে বিশ্বাস করবার সুমতি যেন আমার না হয়। আমার জন্যে এত দরদ, অথচ চিঠি-লেখার সময়টুকু সে পায়না, এ-কথাটি বিশ্বাস করবার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। ইচ্ছা থাক্‌লে উপায় হয়, এ কথা অবিশ্বাস করবার মতো মূর্খ আমি এখনো হই নি।

আমি যে ধরণের চিঠি চাই, তা সবারই পছন্দসই না-ও হতে পারে। তার একমাত্র কারণ, সবাই তেমন চিঠি লিখেনা বা লিখ্‌তে পারে না। চিঠি-লেখা একটা আর্ট। ল্যাম্বের চিঠির মতো অকপট ও সহৃদয় বা কীট্‌স-এর মতো মর্ম্মস্পর্শী চিঠি আমার বেশ লাগে। আর বেশ লাগে, সহসা আনমনে বসে থেকে যে-বন্ধু আমার কথা মনে করে চিঠি লিখেন, তাকে। নেহাৎ জরুরি বা প্রয়োজনের চিঠি নয়, আনন্দের চিঠি, হৃদয়ের চিঠি। ছেলেটির হাম, স্ত্রীর উদরাময়, বাড়ী নিয়ে মোকদ্দমা—এ-সব লেখা পড়ার চেয়ে আত্ম-হত্যা শতগুণে শ্রেয়ঃ। পাওনাদার বার বার তার প্রাপ্য জানিয়ে আমার আত্মসম্মানে আঘাত দিলে, বা জীবনবীমা কোম্পানী হতে

প্রিমিয়াম দেওয়ার তাগিদ এলে, আগুন হ'য়ে উঠি। এত জোর করে যারা আমার উপকার করতে চায়, তাদের সন্দেহ হয়। উপচিকীর্ষা যেখানে ভেদবুদ্ধি-পরিচালিত, সেখানে তার গৌরব নেই। আপন ভুলে যে কিছু করতে পারে, তার কাছে আমি সহস্রবার মাথা নোয়াই। কারণ, সে আমারই প্রতিরূপ, আমাদের পার্থক্য শুধু জৈব, আন্তর নয়।

যে-ধরণের কাটখোট্টা চিঠি 'তোমার পত্র পেয়েছি' দিয়ে শুরু করে 'কেমন আছ' লিখে সমাপ্তির রেখা টানে, তার মতো ফর্‌মেল্ চিঠি না পেলেও আমার চলে। যে-চিঠিতে বন্ধুবর কী লিখে সম্বোধন করবেন, তা ভাব্‌তে পারেন নি, বা ইংরেজী কায়দায় সে-কাজটা সেরে নিয়েছেন তাও ভালো লাগে না। আমার এক বন্ধু কিছুদিন চিঠিতে নামই লিখ্‌তেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, তাঁর লেখাই তাঁর পরিচয়ের বাহন। আমার কাছে লেখা চিঠিতে যে নাম লিখেনা বা অস্পষ্ট করে লিখে, তার ভয় আছে, সে আমায় দূরে রাখে—আমার পাওয়ার ঐশ্বর্য্যকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে, তার দানের মহিমাকেও সে কলঙ্কিত করে।

যে-চিঠি আমার কাছে লেখা, তা সবাইর আগে আমারই পড়া চাই। অনেক লোক পরের চিঠি পড়ে বলে শুনেছি। এদের মতো উদারচরিত লোক তর্কশাস্ত্রের নিয়মেও মানুষের কোঠায় পড়েনা। তারা ভুলে যায় (বা ইচ্ছা করেই এ অন্যায় করে!) যে, চিঠি শুধু দু'জনের—একজনের মন সেখানে উদার হ'য়ে, অসীম হ'য়ে, অক্ষরের আকুতি দিয়ে বিরহকে মিলন করে তোলে। আমার তো মনে হয়, পরের চিঠি না-পড়া অতি সহজ সংস্কৃতির লক্ষণ।

আমি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কথা শুনেছি, তিনি নাকি তাঁর বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের নামে যে-চিঠি আসে, তা না-পড়ে

যথাপাত্রে অর্পণ করেন না (বিশ্বাস করাও পাপ মনে হয়।)। ভদ্রলোক হয়তো বোঝেন না, পিতৃভক্তি জোর করে ভয় দেখিয়ে বা সন্তানদের সঙ্কুচিত করে আদায় করা যায় না! ওটা আষাঢ়ের বৃষ্টিধারার মতো বিশ্বাসের ও নির্ভরশীলতার অবারিত পথে অঝোরে ঝরে পড়ে। দৈবক্রমে তাঁর ছেলেমেয়েরা একান্তই যদি এমন সুশাসনকে সোয়াস্তি বলে গ্রহণ না করবার মতো মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করে, অদৃষ্টে করাঘাত না করে, তখন বরং সে ভদ্রলোকের চাণক্য-শ্লোক, রুশো বা বারট্র্যাণ্ড্ রাসেল্ পড়া উচিত।

পোষ্টকার্ডে চিঠি রীতিমত অপমানকর। এ ভারি স্বচ্ছ—ভারি সরল। এক নিমিষেই এ ধরা দেয়, এর জন্যে এতটুকু সাধনা করতে হয় না। এত খোলাখুলি বলেই এর কোনো সৌন্দর্য্য নেই। আর এ-কথাও সবাই জানেন যে, পোষ্টকার্ডে মনের কথা বলা চলে না—এখানে চলে নেহাৎ দরকারী কথা, যার সঙ্গে প্রয়োজন আছে, রীতিরক্ষা আছে। এ দিয়ে মানুষের চোখে ধূলো দেওয়া যায়। সারাটা পোষ্টকার্ডের গায়ে এতটুকু নিভৃতি নেই, এতটুকু অন্তরের কম্পন নেই। এরূপ প্রাণহীন চিঠি আমি চাই নে। *C/o*-চিঠি বিপদ-জনক। যে লোকটির তত্ত্বাবধানে চিঠি পাঠানো হ'ল, সে যে চিঠিখানার গন্তব্য স্থান নয়, এ সহজ কথাটা অনেকেই বোঝেন না। সে শুধু উপলক্ষ্য, আর একজন লক্ষ্য। উপলক্ষ্যকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁর সুমতি ও সাধুতাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু, লক্ষ্যটিই যে আমাদের চরম, এ-কথা বলাই অত্যুক্তি মাত্র।

ব্যায়ারিং চিঠি এলে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে। তবে, একথা সত্যি, ব্যায়ারিং চিঠি অনেক সময়ই আমার উপর আমার বন্ধুটির অধিকার জ্ঞাপন করে। এ জন্যেই একে অবহেলা করা যায় না। অভাবিত উৎকণ্ঠায়, আকস্মিক বিপদ-সম্ভাবনায় দুরুদুরু বুকে একে গ্রহণ করি।

আমার কাছে কেমন চিঠি ভালো লাগে? বলা ভারি কঠিন, আবার সহজ। আমি চাই, যাতে মন বেশি, কথা কম। এই মনটিকে নিয়েই যত বিব্রত হ'য়ে পড়ি, কতটুকু আঘাতে এ যে ভাঙে, আবার কতটুকু সামান্য সোহাগে এ যে আকুল হয়ে ওঠে, তা বুঝে ওঠা দায়! এর চাওয়ার পরিধিকে কেটে, ছিন্ন করে যদি মনহীন পাথর হ'তে পারতাম, বা রবীন্দ্রনাথের নারায়ণ সিং হ'তে পারতাম, রক্ষা পেতাম। এক কোঁটা মনের অধিকারী হ'লে এত দুঃখ পেতে হয়, আগে জানি নি। যাদের মন নেই, তারা কী সুখী! বেদনা-বন্দনা তারা জানেনা, অকারণে বন-বীথিকায় চাঁদের আলোর আল্পনা দেখে তারা কেঁদে ওঠে না, গোলাপের মূক-গৌরবে তারা অশ্রুবিন্দু প্রত্যক্ষ করে না বা সঙ্গীতের সুর-মূর্চ্ছনায় নিজেদের সর্ব্বহারা মনে করে না।

যে চিঠিতে এন্‌ভেলোপের বা প্যাডের রং-এর ঐশ্বর্য্যের চেয়ে প্রাণের গভীরতা বেশি, যা পড়ে লোকে বল্‌বে, এ'তে কিছু নেই, আমি বল্‌বো, এর বাইরে কিছু নেই, যেখানে ঘোষণাকে, আড়ম্বরকে চুপ করিয়ে শিবের রিক্ততা বড়ো হয়ে উঠেছে, তা আমার এত ভালো লাগে! ইচ্ছাকৃত অবহেলা, যার পেছনে আন্তরিকতার সুগভীর সংযত মাধুর্য্য, তা আমার এত প্রিয়। এ একটা সৃষ্টি—এর লেখক একজন রূপকার। সত্য এখানে সুন্দর, কুশ্রীতা এখানে শোভন, নগণ্যতা এখানে পরম ধন। শুধু একটি মনের কোমল প্রসাধনে, তা আমার কাছে মধুর হ'য়ে ওঠে। এ শুধু আমার বর্ত্তমান নয়, এ আমার ভবিষ্যৎ—সে ভবিষ্যৎ নিরবধি।

আর এক কথা। যে লিখ্‌বে, তার নামের আগে মামুলি পাঠ চাই নে—ছোট্ট করে লেখা চাই, 'তোমার'। 'তোমাদের' লেখা হ'লে চল্‌বেনা—ওতে সম্মানে (?) বহুবচন থাক্‌লেও আমার

প্রতি অবিচার করা হয়। তারপর, নামটি—অক্রুর কৌটার মতো, অভিমান-স্নিগ্ধ তনুশ্রীর মতো,—অপূর্ব্ব! মনে লয়, 'লাখ লাখ যুগ' এখানে আমি একান্ত নিভৃতে আত্ম-সাধনায় নিরত থাকি। আর চাই, সবখানা চিঠি যেন আমার কাছে মানব-স্পর্শে স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে। ওর প্রত্যেকটি ভঙ্গি, ওর রূপক, ওর ব্যঞ্জনা, ওর অনির্ব্বচনীয়তা—সব যেন প্রাণময় হ'য়ে আমার আত্ম-বিস্মরণ আনয়ন করে। রুক্ষ কাগজে এলোমেলো আপাতঃ-অযত্ন-গ্রথিত হরফগুলো যেন অন্তরের আকুতি নিয়ে অনন্ত নাগের মতো আমায় আলিঙ্গন করে রাখে। চিঠিখানা যেন আমার জীবন-বেদ হ'য়ে এর অপূর্ব্ব সঙ্গীতে আমায় অভিভূত করে তোলে। চিঠিটি যেন অন্তরের মৌন মাধুর্য্য নিয়ে, তপস্যার নিশুতি নীরবতা নিয়ে, মিলনের নিভৃত কোলাহল নিয়ে আমার বেদনার ধারায় সার্থক কমল রূপে ফুটে ওঠে। আর মনটি যেন 'দুঃশলা'র মতো উৎকণ্ঠিত, 'হিরন্ময়ীর' মতো একাগ্র, ব্যারেট্ ব্রাউনিং-এর মতো নির্ভরশীল হ'য়ে আমার চোখের সাম্‌নে বায়ু-মণ্ডলে প্রকম্পিত হ'তে থাকে।

আমার মনে হয়, চিঠিদ্বারা বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়, কাছে-না-থাকার রূঢ়তা অনেক লঘু হ'য়ে আসে। এ জন্যেই যে-চিঠিতে আমি বন্ধুদের সঙ্গে যে কোনো সাময়িকী, বা আমাদের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তে আস্‌তে পারি, তা আমার এত প্রীতিপদ। এ চিঠি যেন কথা বলে। আমার এক বন্ধু একদিন অতি সুন্দর একটি কথা লিখেছিলো—'সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, আমরা দূরে সরে' না গিয়ে যেন নিকটতর হ'য়ে আসি। মরণে যে-বন্ধুত্বের বিলয় হয়, তা'ও সহ্য করা যায়, যেহেতু, উহা এত নিরুপায়; কিন্তু ভুল বুঝে', বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম কোন দিন যদি হয়, আমাকে জানিয়ো, তার মীমাংসা করো।' আমারও মনে হয়, কখনো বন্ধুকে যথেষ্ট কারণেও

ভুল বুঝ্‌লে, তা স্পষ্ট ক'রে তার কাছে বলা উচিত। তবেই সমূহ যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। নতুবা, যা গড়েছিলো, তা ভেঙ্গে গিয়ে শুধু শ্মশানই সৃষ্টি হ'বে। গড়া সুকঠিন, ভাঙ্গা সহজ। যেমনটি গড়ে ওঠে, তেমনটি আর হয় না।

চিঠির একটা জিনিসের জন্য আমি নিজেই বেয়ারা হ'য়ে পড়ি। যে-লেখাটি বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথের মতো চিত্রায়িত করে কেটে দিয়েছে, তার অতলস্পর্শতা আমাকে মুগ্ধ করে। যা তার মনে ছিলো, তা তো ভাষায়ই প্রকাশ পেয়েছে, যে-কথা মুখে এসেও তার বুকে ফিরে গেল, যে ফুল ফুট্‌তে গিয়ে ঝরে' গেল, যে-বাণী অকথিত হয়ে অন্তরে আর্ত্তনাদ সৃষ্টি করলো, যে গোপনতম অন্তরটুকু আমাকে দিতে গিয়ে সে ফিরিয়ে নিলো, তার বেদনার কাহিনী আমাকে যে আকুল করে তোলে।

চিঠির 'পুনশ্চ'-টুকু আমার কাছে বড়ো উপাদেয়। এখানে বিশেষ কিছু নেই, তবু। শেষের পরে, অশেষের এই ইঙ্গিতটুকু অতি মধুর।

পুরানো চিঠি আমার জীবনের পরম সঞ্চয়। যখন সেকস্‌পীয়র রবীন্দ্রনাথ বা বৈষ্ণবকবিতাও আর আমার ভালো লাগে না তখন আমি এদের আশ্রয় নিই। আমার কাছে লেখা চিঠির একটি পৃষ্ঠাও আমি হারাই নে বা নষ্ট করি নে। মন যখন অবসন্ন হ'য়ে আসে, তখনি ধীরে, অতি ধীরে, চিঠিগুলো আমি পড়ি। এরা কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখনো বা অভিমানে মুখ ফেরায়। চিঠি পড়তে পড়তে হয়তো, যে লিখেছে, তার কথাই ভাব্‌তে থাকি। এ ভাবে আমি সত্যের সাহায্যে আত্ম-চরিত রচনা করি। আমার মনে হয়, বিশ্রামসময় কাটানোর জন্যে, এর চাইতে ভালো উপায় আর নেই। এ চিঠি আমার অতীতের বন্ধু, বর্ত্তমানের অবলম্বন, অনাগতের মন্ত্র-দ্রষ্টা।

এদেরই সাহায্যে, যে-বন্ধু আমার কাছে নেই, তার সঙ্গে কথা বলি, যে আমার কাছে নীরব, তাকে মুখ করে তুলি, যে সব ভুলে গেছে, এ তারই অভিজ্ঞান, আবার, যে মরে গেছে, এ তারই শেষ-চিহ্ন।

চিঠি পেতে চাওয়ার বিপদ বড়ো বেশি। কোনখানে জরুরি কাজে যেতে হ'লে যেমন, পথের বাঁকে ঘোড়ার গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করলে, একটি গাড়ীও পাওয়া যায় না তেমনি খুব-দরকারের সময়, মাথা কুট্‌লেও একটি চিঠিও আসে না। উন্মুখ হ'য়ে আছি, আজ ক—'র চিঠি আমার চাই-ই, পাই হয়তো খ—'র। তখন বুকভাঙ্গা অভিমানে নুয়ে পড়ি, ভেঙ্গে পড়ি,—অশ্রুর বন্যা এসে আমায় প্লাবিত করে। যার লেখা উচিত, সে লেখে না। এখানে একটি কথা আমার মনে পড়ে। কে যেন আমায় একদিন বলেছিলো, সবচেয়ে নিকটতম বন্ধুই সবচেয়ে মারাত্মক 'শত্রু'। সেই অসামান্য কথাটির অর্থ আজ বুঝ্‌তে পারি। সবচেয়ে আপনার কে, বলা তো কঠিন নয়। যাকে আমরা সহজেই পাই, সে সহজেই সহজ। যাকে বেদনা দিয়ে পাই, যার জন্যে হাহাকারের তাপ-যন্ত্রে পারদ-রেখা শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছয়, সে-ই সবচেয়ে কাছের। (তাকে শুধু বন্ধু বলে তার অপমান করবার ইচ্ছে আমার নেই)। গভীর আনন্দ দেওয়ার অধিকার আছে বলেই, মর্ম্মন্তুদ বেদনা দেওয়ার ক্ষমতা তারই হাতে! অথচ, বিপদ এই, এ শক্তিশেলের কোনো বিশল্যকরণী নেই—এ অপমানের নালিশ নেই, এ বেদনার প্রতিকার নেই। রাগে, আত্মঘাতী অপমান-বেদনায় Paphnutius-এর মতো ভগবানের মুখে থুথু দিলেও মঙ্গলময়ের এতটুকু চেতনা হয় না। মনে মনে অগত্যা ডাক-হরকরাকেই দোষ দিই। (সে-ই বা আর কী করবে, তা'র লেখা চিঠি তো চাই নি?) কিন্তু, যারা লেখে

না, তাদেরও দোষ দিতে পারি নে—তাদের সম্বন্ধে খারাপ ভাব্‌তেও যে পারি নে, এইটে বোধ হয় আমার পক্ষে চরম অভিশাপ ও আনন্দ। কখনো ইচ্ছা হয়, ডাক-হরকরাকে শিখিয়ে দিই, কাল থেকে বলো, 'আপনার চিঠি আস্‌ছে'—এতটুকু মিথ্যা কথায় তোমার স্বর্গচ্যুতি হ'বে না। কিন্তু পারি নে—একটা অতলস্পর্শ নৈরাশ্যে অবশ হ'য়ে পড়ি। হাঁ, কই, কা'র চিঠি ?—অসীম উৎকণ্ঠায় হাতে নিয়ে দেখি প্রথম ছত্রেই লেখা—'*Dead, Come sharp*'—বহুদিন পর বুঝ্‌তে পারলাম, জীবিতাবস্থায় যার খবর পাওয়ায় অধিকার আমার ছিলো না, মরণে তারই শেষ খবর নিয়ে এলো।

চা-খাওয়া

সে-দিন দীনবন্ধু মিত্রের অনুকরণ করে এক ভদ্রলোক বল্‌ছিলেন (তিনি অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক) যে, আধুনিক যুগোপযোগী প্রভাত-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায়—

রাত পোহালো ফরসা হলো কাক ডাকে কা,
ঘুমের ঘোরে, সবাই বলে, চা, চা, চা······

ভদ্রলোকের কবি-প্রতিভা দেবী সরস্বতী বন্দনায়ও শানিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। মন্দকবি হয়েও তিনি যশঃপ্রার্থী। যাদের পদ্য, 'পদ্য কি গদ্য কেবল চন্দয় জানা যায়,' তিনি প্রায় সেই শ্রেণীর। যেখানে ভাবের মাথায় লাঠি মেরেও তিনি কবিতা লিখে উঠ্‌তে পারেন না, সেখানে মধুসূদনের নাম করে, তিনি অব্যাহতি পেতে চান। মাঝে মাঝে, হুইট্‌ম্যানের নামও তার মুখে শুনি। তাকে কিছুতেই বুঝানো যায় না যে, না-মিল্‌লেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয় না। সশ্রদ্ধভাবে কতবার তাঁকে বলেছি, 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ দুর্ব্বল ও অক্ষমের সাহিত্য-বিলাসের উপকরণ নয়—এটির ক্ষমতা-দৃপ্ত আত্মপ্রত্যয়ী কবি বিদ্রোহী প্রাণ-প্রস্রবণ'। অশক্তির অপ্রকাশে দোষ নেই, কিন্তু আস্ফালনে হাসি পায়। ভদ্রলোক ভালো লেখেন বল্‌লে খুশি হতেন, জানি; কিন্তু সবাইকে খুশি করতে চাওয়ার বিপদের কথা ছেলেবেলায় গল্পে পড়েছি। যাক্ সে কথা। আমি কবিতার কথা বল্‌ছিনে—আমি বল্‌ছি, 'চা'-র কথা, যা দেহটাকে শীতল করে, আবার ঋতুবিশেষে উষ্ণ করে বলেও পড়েছি, জেনেছি।

কথা হতে পারে, চা না হ'লে এমন কি আর হতো? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চা না খেয়েও আমাদের চেয়ে কম ছিলেন কিসে? হাঁ, কম-বেশির প্রশ্ন নয়, তবে, তারা চা খেতেন না, এইটে পরম সত্য।

অনেকে চা খাওয়াকে বাহুল্য বলে মনে করেন, বলেন, ভাত হ'লেই তো চলে। চলার কথা ?—সব অবস্থায়ই তো মানুষের চলে, চল্‌তেই যে হয়, কারণ তার জন্যে কেউ তো আর বসে থাকে না !

কিন্তু কয়েকটি একান্ত ব্যাক্তিগত কারণে আমি চা ভালবাসি। খাওয়া ব্যাপারটির মতো দুরূহ আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। খাওয়া খুবই দরকার, জানি, কিন্তু খাওয়াটিই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বেঁচে থাকতে হ'লে খেতে হয়, কিন্তু খেয়েই শুধু বাঁচা যায় না—এ অভিশপ্ত কথাটি আমাকে পেয়ে বসেছে। 'অভিশপ্ত' বলার কারণ, আমার দলে লোকসংখ্যা খুব বেশি না-ও হতে পারে। আমার মনে হয়, অনেক-কিছু খাওয়ার মধ্যেই একটা স্থূলত্ব আছে। এই ধরুন, ভাত-খাওয়া। উঃ সে কী ভীষণ সময় লাগে ! এতগুলো খাবার জিনিষ আমার দেখ্‌তে মন্দ লাগে না, কিন্তু খেতে হবে বল্‌লে সত্যি ভয় হয়। কেবল চা-খাওয়াটি সম্বন্ধে আমার বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে। এর মধ্যে বেশ একটি সুষ্ঠুতা আছে, সৌন্দর্য্য আছে। এখানে অতিকাম্যতার চেয়ে সুচিক্কণ মৃদুতা বেশি। এর সঙ্গে যে-টুকু উপসর্গ অনেক সময় থাকে, বা থাক্‌তে পারে, তা-ও বেশ পরিপাটী ও পরিমিত। এ যে-কামনা জানায়, তা'তে গৃধ্নুতা নেই, আমন্ত্রণ আছে।

চায়ের যখন প্রয়োজন, তখন চা চাই-ই। 'চা' বলে, ডাকা মাত্র 'চা' না এলে ভারি দুঃসহ লাগে—যা তা' করতে ইচ্ছে করে। কেন হবে না চা ?—কোনো কারণ আমি শুনতে রাজী নই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলেন, "চায়ে বিলম্ব সয় না—পোষ্টআফিসের পেয়াদাও তথৈবচ"। চা আস্‌বে, চা আস্‌ছে—কী অপূর্ব্ব ছুটির পালা। মনে হয়, এখন আমায় আর কোনো কাজ নেই, অন্ততঃ, থাকা উচিত নয়। চা তৈরী করবার যে শব্দটুকু আমার কানে ভেসে

আসে, তাতেই আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি। চা আস্‌ছে, এই যেন চাম্‌চেটা গড়িয়ে পড়লো—টুং! শব্দটি কী মধুর, কী মৃদু! এ পাগল করে, বিহ্বল করে—আমি কান পেতে রই, শুনি আর শুনি, মনে হয়, সে যেন আসে, আসে, আসে। কিন্তু কৈ?—অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি, চীৎকার দিই—'চা হ'লো?' সহসা দেখি, চা—হাঁ, এসেছে। আমার সুখ-দুখ-মন্থন-ধন এসেছে। এর কূলে কূলে ভরা প্রাণের অঞ্জলি দেখে লোভ হয়। জানি, এটি আমারই জন্যে, তবু, এক চুমুকে তো একে শেষ করা যায় না। না, আধ ঘণ্টার কম সময় এক পেয়ালা চা শেষ করা যায় না, মানে, করা উচিত নয়। তা হ'লে বিশ্রামটি সশ্রম হয়ে ওঠে। আমি চাই, চা উপলক্ষ্য করে অতি সুন্দর একটি আলস্য-মধুর বিরাম-গোধূলি সৃষ্টি করতে। চাম্‌চেটা নিয়ে পেয়ালার গায় আন্‌মনে তাল ঠুকে যাই, সে যেন সঙ্গীত হ'য়ে অঝোরে আমার উপর ঝরে' পড়ে। গায়কের বেদনা মধুর কণ্ঠস্বরে আমিই তখন নবজন্ম দিই, তা'র বায়ু-লঘু সুর আমারই পাশে এসে কাঁপন জাগায়। প্রচণ্ড গতিশীল এই সভ্যতার বুকে বসে আমি এরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাই, গতির মধ্যে স্থিতির বোধন করি। তখন দেখি, কত লোকের মেলা, অতীতের কত স্মৃতি-কণা সেখানে দেহী হ'য়ে উঠেছে। আমার অনাগত ও অনাহত যেন সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায়। স্মৃতি-কণাগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে, হেসে ওঠে, গেয়ে ওঠে, কেঁদে ওঠে—সরে যায়, আবার তাকায় বিদ্রূপ করে!

চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে বেশ চিন্তা করা যায়, ভাবা যায়, লেখা যায়। চা জুড়িয়ে যাবে? চিরকাল গরম কী-করেই বা থাকে! তাতে আমার এতটুকু খেদ নেই। চা আমার সামনে আছে, এইটেই আমার সান্ত্বনা। তবে আর কী?—প্রতিটি চুমোয় দেহটা যেন সূক্ষ্ম হ'য়ে ওঠে। 'সকল দৈন্যের এ যে মহা অবসান'। সত্যি, নিঃস্বকে

পূর্ণ করবার এর যথেষ্ট ক্ষমতা, তাইতো আমিও ভরপুর হ'য়ে উঠি। লেখাগুলো তখন জলের মতো বেরিয়ে আসে, ভাবনার জলস্রোতে এতটুকু দ্বীপ-সৃষ্টি হয় না। আমার তো মনে হয়, এ জন্যেই ডাঃ জন্‌সন্‌ অন্ততঃ পঁচিশ পেয়ালা চা না খেয়ে লিখ্‌তে বস্‌তেন না। তিনি বোধ হয় চাইতেন, দেহের আকারটিকে দেহ-হীন করে তুল্‌তে। তারপর, আমাদের শরৎচন্দ্রই বা কম কিসে? দৈনিক ২০।২৫ পেয়ালা চা না খেলে 'চরিত্রহীন' বা 'গৃহদাহের' মতো বই লেখা যায় না (আমি হলফ্‌ করে বল্‌তে পারি)। চায়ের আমেজে সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাপিয়ে ওঠে।

সাবধানী লোক বলেন, চা খেতে হয়, বাড়ীতেই খাবে, দোকানে চা-খাওয়া ভালো নয়। সংসারী লোকের খুব হিসেবী কথা বটে। আমার কিন্তু মনে হয়, মানুষ যা হিসাব করে, তার উপরও যখন আর একজনের হিসাবই বেশি কাজ করে, তখন আমাদের হিসাবে কী হ'বে? যা হোক্‌, একটি বিশেষ কারণে আমি দোকানে চা খাওয়াটিকে অপছন্দ করি নে। লোক-চরিত্র ও জন-প্রগতি সম্বন্ধে ধারণা করতে হ'লে চা'র দোকানের মতো এমন মিলন-তীর্থ আর একটিও নেই। 'হেথায় আর্য্য হেথায় অনার্য্য হেথায় দ্রাবিড় চীন' —সবাই এসে এখানে মিলিত হয়। চুপ্‌টি করে গিয়ে বস্‌তে হবে, এক কোণে, নিরালায়। হরেক রকম লোকের হরেক রকম কথা-শোনার মধ্যে আনন্দ আছে বই কি?

একথা অস্বীকার করার মত বঞ্চনা নেই যে, একা কখনো চা খাওয়া জমে না। আনন্দই যেখানে মুখ্য, একাকীত্ব সেখানে যক্ষোপম নির্ব্বাসন। দু' একটি সমপ্রাণ বন্ধু না হ'লে চা খাওয়ার আনন্দ গভীর হয়ে ওঠে না। কথাবার্ত্তার মধ্যে এক একটি চায়ের চুমুক যেন জীবন্ত উৎসাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চা-খাওয়াটি

মানুষের স্বার্থপরতাবোধ অনেকখানি কমিয়ে দেয়। আজকালকার অবনত স্বার্থ-বোধের দিনেও চা-খাওয়ার অভ্যাস রাখ্‌লে, মানুষ বোধ হয়, এখনো বুঝ্‌তে পারবে, 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। অতি-সাধারণ একটি জৈব ব্যাপার মানুষকে এতখানি মহত্ত্ব দান করতে পারে, এইটে কম লাভের কথা নয়।

অনেকে চা-পানকে বিষপান বলে নিন্দে করেন। কিন্তু, নীলকণ্ঠ না হ'তে পারলে পৃথিবীকে যে ভালবাসা যায় না, একথা কি ভেবে দেখেছেন কেউ? তবে, চায়ের এত নিন্দে কেন? অতি সাধের দেহটি নষ্ট হ'য়ে যাবে? তাতেই বা কী ক্ষতি? ধ্বংসই তো সৃষ্টির আদি কথা। ভগবান যেমন নির্ম্মমভাবে নিজের সৃষ্টিকে নষ্ট করেন, তেমন ঔদাসীন্য কি কোন মানুষে সম্ভব? এ ঔদাসীন্য তাঁর আছে বলেই ধ্বংসের শ্মশানে বসে তিনি তপোমগ্ন ধূর্জ্জটি। আমারও মনে হয়, বিনাশই সৃষ্টির প্রথম ও শেষ কথা। বিজ্ঞানী বলেন, সমস্ত কিছুই ক্রম-বিকাশের দিকে চল্‌ছে। আমি বলি, এইটে ক্রম-বিকাশ নয়, ক্রম-নাশ। ধ্বংস হ'লেই নিস্তার বা মহা-নির্ব্বাণ। না, আর হ'লো না। চা-এর কথা নিয়ে শেষটায় নির্ব্বাণের মধ্যে এসে পড়েছি? 'ধম্মপদ' খানা আমার আবার পড়তে হ'বে।

কিন্তু, আপাততঃ, আমার এক পেয়ালা চা দরকার— হাঁ, এখুনি দরকার।

সাহিত্য

অনেকরই একটি বদ্ধমূল ধারণা থাকতে পারে যে, যা আমাদের মধ্যে হিত ও কল্যাণের ভাব এনে দেয়, তাই সাহিত্য। আমার কিন্তু মনে হয়, অহিত ও অকল্যাণ সৃষ্টির ক্ষমতা সাহিত্যের মতো আর কারো নেই। মানুষকে মানুষের চাইতে পৃথক করবার জন্যে হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতির এতটুকু প্রয়োজন নেই। সাহিত্য একাই এক শো'। সাহিত্যই মানুষকে একাকী, ভীষণ একাকী, নিঃস্ব, অসহায়, ও সম্বলহীন করে তোলে। সাহিত্যের মধ্যে অনুভূতির যে তীব্রতা ও ভাবাবেশের যে উন্মত্ততা থাকে, তাতে মন ক্রমেই সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হ'য়ে ওঠে। মানুষ যত বেশি স্থূলে থাকে, তত বেশি সুখী। সূক্ষ্মতর জগতে বিচরণ করে সে দেখে—এ শুধু স্বপ্ন। স্বপ্নই তাকে এমন করে পেয়ে বসে যে, বাস্তবের সঙ্গে তখন তার বিরোধ আসে। সাধারণ কথায় সে কাঁদে, সাধারণ কথায় হাসে—এমন কি, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। এমনি করে মিথ্যাকে সে সত্যের চেয়ে বড়ো স্থান দেয়। তখনি, তার জীবনের অভিশাপ ফলতে শুরু করে।

সাহিত্য যিনি ভালবাসেন (যার ভালো লাগে, তার কথা বলছি নে) তার জীবনে শুধু ফাঁকি। ডনকুইক্সটের মতো অসম্ভবকে শুধু সম্ভব নয়, নিশ্চিত বলে মেনে নিতেও তার বাধে না। সাহিত্যে মতো এমন নিষ্ঠুরা প্রিয়তমা আর হ'তে পারে না—এ সবখানি চায়, কমলাকান্তের মতো এ 'সরিকিতে' নেই। উপায় নেই—এত ভালবাসে বলেই, সে ত্যাগ করতে জানে না।

সাহিত্য যাদু জানে। তাই, পাঠকের মনের কাছে ঘেঁষে কথা বলবার, তাকে বুঝিয়ে দেবার, পথে বসাবার ক্ষমতা এমনটি

আর কারো নেই। গুণ্‌গুণ্‌ করে, সে যে কী বলে, সে-ই জানে। পাঠক বেচারা, নিজের ব্যক্তিত্বটুকু অবলীলাক্রমে তার কাছে বিসর্জ্জন দেয়। কখনো সে 'কমলমণি'র মতো হাস্য-পরিহাসে লঘু-চপলতায় অধীর করে তোলে, কখনো বা 'কিরণময়ীর' মতো তর্ক করে, বোঝায়, অভিমানে মুখ ফিরায়, আবার 'যাহারে বেসেছে ভালো তাহারে কাঁদায়'। কী অপরিসীম এর মোহিনী-মায়া!

সাহিত্যিকরা কী যে সব বলেন!—তারাগুলি নাকি ফুল, মরণ নাকি শ্যাম-সমান, সব-হারানোই নাকি সব- পাওয়া, প্রেম নাকি অমর—সাত সাগরের জল নাকি একে বিনাশ করতে পারে না! আবার শুনি, এঁরা নাকি পাখীকে পাখী বলে ডাকেন না—মনে করেন, এ আলোর ধ্বনি, রহস্যময় সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা। এঁরা শিশুকে বলেন দ্রষ্টা, জড়-প্রকৃতিতে দেখেন, প্রাণের লীলা-চপলতা, চাঁদের মতো আগুনে-পোড়া জিনিসটাকে বলেন—সুধাংশু! সাজিয়ে সুন্দর করে বল্‌তে সাহিত্যিকরা ওস্তাদ। অনেক সময় এদের বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি। যা হয় না, হ'তে পারে না—তাকেও সত্য ব'লে মেনে নিতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না। জীবনের নিস্ফলতাকে, শূন্যতাকে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে ভরে দেন—আবার বলেন, এইটেই হ'লো আসল। কী অদ্ভুত কথা—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, টেনিসন্‌ পর্য্যন্ত বলেন যে, যে মরেছে, সে মরেনি, সে আছে—ভোরের আলোয়, তারার দেশে, আমার পাশে। এমন সব উদ্ভট কথা ব'লে দুনিয়ায় আর কেউ শ্রদ্ধা পায়নি।

সাহিত্যিকদের মনটি কিন্তু বড়ো কোমল। এ'রা কোনো শক্ত কাজের যোগ্য থাকে না। কী করেই বা থাকে? চাঁদের আলোয় যারা থমকে দাঁড়ায়, সুন্দর কিছু দেখ্‌লে যারা অবশ হ'য়ে পড়ে, (কাঁদে পর্য্যন্ত!), তাঁদের মেরুদণ্ড ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে

আসে। একজন বিখ্যাত লেখক বলেন, আমরা বেদনা দিয়ে যা পাই, গান দিয়ে তার ভাষা দিই। এমনি করে বেদনার গান দিয়ে মানুষকে কোমল করে ফেল্‌লে তার যে আত্মরক্ষার শক্তি-টুকুও থাকে না—সে দাঁড়াতে চায়, বসে পড়ে, হাস্‌তে চায়, কেঁদে ফেলে।

অনেক সাহিত্যিকই বলেন, যে তাদের নাকি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই—তাঁরা নাকি সকলের মধ্যেই আছেন। সেক্স্‌পীয়র সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে, তিনি নির্য্যাতিত সাইলকেও আছেন, উন্মত্ত লিয়ারেও আছেন, মধুরতরা অফিলিয়ায়ও আছেন, আবার কোথাও নেই। আসল কথা হ'লো, সাহিত্যিক নিজে মুমুক্ষুতম জীব। তিনি নিজে বাঁচতে চান—তাঁর বেদনাকে ভাষা দিয়ে তিনি নিজেকে লঘু করেন। আর, তিনি লেখেন, একান্ত-ভাবে তাঁরই জন্যে। যেখানে তিনি দরজীর মতো ফরমায়েসী সাহিত্য রচনা করেন, সেখানে তাঁর নিজের অপমান করা হয়। যে-সাহিত্য তাঁর অন্তরের তাগিদে জন্মগ্রহণ করে, তার মধ্যেই তাঁর মুক্তি। সাহিত্য তো আর জামা কাপড় ব্লাউজ বা রুমাল তৈরী নয়! যিনি নিজেকে সহজে, ফুলের মতো, প্রেমের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনিই সত্যিকারের সাহিত্যিক। এর পেছনে নিছক আত্ম-মুক্তি ছাড়া আর কিছু নেই।

সত্যিকার সাহিত্যিক পৃথিবীর লোক নয় এখানেই তাঁর জীবনের পরম অভিসম্পাত। তিনি মনে করেন, সব চেয়ে বড়ো জিনিস মন—মানুষের মন। কিন্তু, মন নিয়ে যে মাটির পৃথিবীর চলেনা, এইটে যখন তিনি বোঝেন, তখন আর তাঁর ফিরে-চলার পথ নেই। কোল্‌রিজের বৃদ্ধ নাবিকের মতো, তিনি যেন সংসার-সমুদ্র-বক্ষে একান্ত একা—চারিদিকে মৃত্যুর লীলা, নিঃসঙ্গ

নির্জ্জনতার বিকট প্রতিধ্বনি। তবু যদি তিনি বেঁচে থাকেন, তার চেয়ে তাঁর মরণ ভালো। চরম দুঃখের কথা, তবু তিনি মরেন না—এইটেই তাঁর ট্র্যাজিডি। ইচ্ছা করলেও যে মরা যায় না, তিলে তিলে বেঁচে থেকে যে জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, এর চেয়ে গভীরতর ট্র্যাজিডি তো হ'তে পারে না। সাহিত্যিকের কপালে বিধাতা পুরুষ এ বাঁচার ট্র্যাজিডিই লিখেছেন।

বিশ্বাস করা

সে-দিন রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিকের' প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক (বলা ভালো, তিনি আমাকে অত্যন্ত নির্ভরশীল ব'লে ভেবে নিয়েছেন) এসে উপস্থিত। আমার কথার উত্তর না দিয়েই তিনি বল্লেন, 'জরুরি কাজ, শুনুন'।

'যথা ?...'

'আচ্ছা, সেক্স্‌পীয়রের এত নাম কেন ?—এত মিথ্যা কথা যিনি বলেন..., আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বল্লাম—সেক্স্‌পীয়র ? বলেন কি ? উত্তেজিত ভাবে তিনি বল্লেন, 'মিথ্যা নয়তো কি ?—সমগ্র নারীজাতিকে কলঙ্কিত করে তিনি বলেছেন, '*Frailty, thy name is woman !*'

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম—বল্লাম, 'এ কথা তো *Hamlet* বলেন—সেক্স্‌পীয়র তো নয়'।

'নিশ্চয়ই সেক্স্‌পীয়র—আপনি তাঁকে বাঁচাতে চান'।

আমি অতি নম্রভাবে বল্লাম, 'তাকে বাঁচানোর কর্তা তিনি স্বয়ং—যে তাঁকে বাঁচাতে চায়না, সে নিজেও বেঁচে আছে ব'লে আমার বিশ্বাস নেই'। তিনি আগুন হ'য়ে বল্লেন, 'হ'তেই পারে না—অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব ?'

'নারী এতখানি নীচ হ'তে পারে না—তাদের মতো এমন বিশ্বাসী, এমন......,'

আমি একটু হেসে বল্লাম, 'কাউকে ভালবেসে ফেলেছেন বুঝি ?'

অপ্রস্তুত হ'য়ে তিনি বললেন, 'সত্যি আপনার কাছে না ব'লে পারছি নে। হাঁ, দেখুন এই সে-দিন ওরই সঙ্গে হ্যামলেট আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ ছত্রটি পড়তেই সে কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, 'তুমিও আমাকে তাই ভাব?' আমি বল্‌লাম, 'কী যে বলো তুমি—'

'তারপর—'

'তারপর—সত্যি, এমন নিষ্ঠা আর দেখিনি।'

'এর চেয়ে কম বা বেশি দেখেছেন বুঝি?'

'তা নয়—এইটে আমার প্রথম ও শেষ। শুনুন, সে বলে, যে-ভাবেই হোক সে আমাকে চায়ই। এর পরও কি আপনাদের সেক্সপীয়রই হ'লো বড়ো?'

'আপাততঃ, নয় নিশ্চয়ই—'

'ভারিতো মুশ্‌কিল—তা হ'লে আপনি কী বিশ্বাস করেন?'

'সবই সময় সাপেক্ষ। এক কথায় সবই বিশ্বাস করি, আবার কিছুই বিশ্বাস করি নে। মানুষ মানুষ হ'য়েও দেবতার চেয়ে বড় হ'তে পারে, আবার অতি নীচ হ'তে পারে। বিশ্বাস করি, নবকুমারকে বন্ধুগণ বিপদেই ফেলে এসেছিলো, বিশ্বাস করি, বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষকেও লোকে কলঙ্কিত করতে চেষ্টা করেছিলো। কথা দিয়ে কথা অনেকেই রাখেন না, এইটে যেমন বিশ্বাস করি, কথা না-দিয়ে, অনেকে আবার তার চেয়ে বেশি কাজ করেন, এইটেও বিশ্বাস করি। আসল কথা, সবই বিশ্বাস করি। তাই, লোকে যাকে অভাবিত মনে করে, আমি তাকে সত্য ব'লে ভেবে নিই।'

'আর কী বিশ্বাস করেন?'

'বরং বলুন, কী বিশ্বাস করি নে। ভগবান সাতদিন বসে পৃথিবী তৈরী করে রবিবার দিন বিশ্রাম করলেন, বিশ্বাস করি। মধুসূদনের

মতো বিশ্বাস করি, রাবণ রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়ে বিশ্বাস করি, রাধা-কৃষ্ণ-কাব্য শুধু বৈকুণ্ঠের তরেই নয়, ওটা মানুষেরই কথা। অভিমন্যু মাতৃগর্ভে থেকেও যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন, আর অনেকে বয়স হ'লে পাখীও মারতে পারেন না, এইটেও বিশ্বাস করি। বায়োস্কোপ দেখে চরিত্র নষ্ট হয় না, এইটেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ, এ জিনিসটি আমদানী হওয়ার আগের যুগের মানুষের মধ্যেও বহু লোকের এ ছাড়াই ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। শরৎচন্দ্র 'ভেলুকে' মানুষের চেয়ে কম ভাল-বাসেন নি, শাহজাহানের অর্থনীতি-জ্ঞান কম ছিলো—(উঃ, বিশ কোটী টাকা কোনো ব্যাঙ্কে রাখ্‌লে!)—বিশ্বাস করি, ওমর খৈয়ামকেও বিশ্বাস করি, আবার, শূন্যবাদও উপেক্ষা করি নে। ভারি অদ্ভুত নয়? হাঁ, আরো বিশ্বাস করি—

পাঁচ বোন থাকে কাল্‌নায়,
সাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আল্‌নায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জাল্‌নায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডাল্‌নায়॥

আমার কথায় ভদ্রলোক চটে গিয়ে বল্‌লেন, আপনি কিছুই বিশ্বাস করেন না। ব'লেই তিনি উঠ্‌লেন। আমি করজোরে বল্‌লাম, দোহাই আপনার, বিশ্বাস যদি করেন, তবে বসুন, আসল কথাটি বলি—

'আর দরকার নেই'—এই ব'লে তিনি সাঁ করে চলে গেলেন—আমার মনের কথাটা জেনে পর্য্যন্ত গেলেন না।

আমার ঘর

একজন বিখ্যাত লেখক বলেন, কোনো জিনিসকে আমার বলে মনে করাটাই চূড়ান্ত বোকামি। কথাটা অনেক দিন বিশ্বাস করি নি। কিন্তু, তেমন কিছু নয়, সামান্য একটি ঘর, যার বুকে আমারই নাম অঙ্কিত করেছিলাম, তাও যে আজ নেই! নেই বলেই যে সে আমার কাছে গভীর করেই আছে, একথা কী করেই বা বুঝাই! কী করে যে বুঝাই, এর কাছে না থেকেও এর অন্তরে, এর থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়েও আমি এরই পাশে?

ঘরটির পরিচয়? বিশিষ্ট পল্লীতে 'কুটীর' নামধারী একান্ত বিনয়ী সে নয়। কণ্বের তপোবনের নিভৃতিও এর ছিলোনা—এ ছিলো, সহরের শব্দ-মুখরতা যেখানে গ্রামের নিশুতি সবুজে মিশে যায়। কোনো দিন এর অঙ্গ-রাগের প্রয়োজন হয় নি। এর স্বচ্ছন্দ-সৌন্দর্য্যের উপর ছবি-ঘরের বিজ্ঞাপনই ছিলো যথেষ্ট। 'দিদির' গৌরবের দ্বাদশ সপ্তাহ না যেতেই 'মালা বদলের' পালা আস্‌তো—তারপর দেখি, এ যে 'ইম্পোষ্টার' (হায়রে 'ভাগ্যচক্র'!)

অনেকেই বল্‌তেন, ঘরটির নাকি একটা মোহ ছিলো। কিসের মোহ, জানি নে। আমার শুধু মনে হয়, এর অণু-পরমাণুতে কত না স্মৃতি! এ যেন 'ক্ষুধিত পাষাণ'—স্মৃতি-বহনই এর কাজ। কিন্তু এর বিশৃঙ্খলার মধ্যেই আমার প্রাণটুকু ছড়িয়ে ছিলো। এর চাইতে একটু ভালো বা একটু মন্দ হ'লে এটা যে সে-দিনই আমার অযোগ্য হ'য়ে যাবে। এত নিকট করে একে পেয়েছিলাম বলেই কথা বলে একে দূরে সরিয়ে দিতে চাই নি। যে দূরের, তার সঙ্গে কথা-বলা চলে, যে কাছের, তার সঙ্গে চুপ করেই থাকতে হয়। নয়?

জীবনের পথ চল্‌তে এ ঘরটিকে আশ্রয় করে যাদের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিলো, তন্মধ্যে প্রথমেই মনে আমার ত—'র কথা। 'জীবানন্দের' মিনতি দেখেছি তাঁর চোখে-মুখে —কিন্তু বাইরটা ছিলো তাঁর ভারি রুক্ষ ও শুষ্ক। মানুষ চেনার এত ঝোঁক তার ছিলো যে, তাঁর সঙ্গে শুধু কথা চল্‌তো হাত-দেখা ও কোষ্ঠীর ফলাফল নিয়ে।

দ—'র মত পার্থিব ব্যাপারে ওয়াকিফহাল লোক কমই দেখেছি। কথায় কথায় একদিন তিনি বলেছিলেন, '*Be selfish*'—এ কথাটাই যদি বুঝ্‌তে পারো, পৃথিবীতে বাঁচতে পারবে। তিনি নিজে Hobbes-এর ভক্ত কিনা জানি নে। অদ্ভুত তাঁর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও জন-ভীতি। তিনি প্রায়ই বল্‌তেন, জ্ঞানী হতে হ'লে লেখাপড়া করতে হয়না, লেখাপড়া করেছি, এর ভাণ করতে হয়। অ—'র মতো সবাইর সঙ্গে মিশে চল্‌বার ক্ষমতা আমি কম দেখেছি। মানুষ খারাপ হতে পারে, এটা সে বিশ্বাসই করে না। ন—'র কথা মনে হ'লে মনে পড়ে, কী চঞ্চল দৃষ্টি, কী অভাবনীয় বেদনায় ভরা। কথা দিয়ে সে কথা রাখে না—তবু, কোনো দিন তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি। সে এসেই চুপ করে বসে থাক্‌তো,—হঠাৎ বলে উঠ্‌তো, না, যেতে হ'বে, খুব দরকার। (হয়তো তেমন কিছুই নয়)। শ—,ভারি সরল ও অকপট। এতখানি প্রাণভরা দরদ ওর আছে বলেই, সে যেন কিছুই করতে পারে না। সব চেয়ে যে বেশি আঘাত দেয়, তাকেও সে কটু কথা বল্‌তে পারে না—অভিমান ক'রে কেঁদে ফেলে।

গ—'র মধ্যে আন্তরিকতার একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ ছিলো। তুলসীর মূলে প্রণতির মতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার জুটলো শুধু ফাঁকি। তার সঙ্গে তর্ক করতে পারি নি, আমরা যা বুদ্ধি দিয়ে বল্‌তাম,

সে তা প্রাণ দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে বল্‌তো। কিন্তু, প—'র কথা মনে হ'লেই মনে পড়ে, এদের জন্যে যেন সংসার নয়। কী ধীর অথচ উদ্বেল, মুখর, অথচ ব্রীড়াময়। তারই কৃপায় যে আজ রীতিমত নাম-জাদা হ'য়ে তাকে উপেক্ষা করে, তার কথায় সে হেসে ওঠে। তাকে সত্য করে চিনেছি, যে দিন তার পরম বন্ধুই তাকে ষড়যন্ত্র করে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিলে। মানুষকে ভালবাসলেই কি তাকে হত্যা করবার অধিকার দেওয়া হয়? আজও তার সঙ্গে কথা বলি—সে কি শোনেনা? কবি তো আশ্বাস দিয়ে বলেন—

গভীর নিশীতে এপারের কথা ওপারেও শোনা যায়।

—তবে? সে নিরুত্তর কেন? আমার সকল কথা যেন একটি মাত্র জিজ্ঞাসা-চিহ্ন রূপে চোখের সামনে ভেসে আসে। বার বার তাকে প্রশ্ন করি, সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে। তার অদৃশ্য অঙ্গুলিতে যেন লেখা হয়—'?' এই 'শেষ-প্রশ্নের, উত্তর আজ আর কে দিবে?—আজ যে শরৎচন্দ্রও নেই!

প্রশ্নকর্তার মনস্তত্ব

হাতের লেখা দেখে নরনারীর চরিত্র যতটা আবিষ্কার করা যায়, অথবা ভৃগুর মতে কর-রেখা দেখে ভাগ্য গণনায় যতখানি নিশ্চিত হওয়া যায়, তার সত্যতা যেমন *Empirical*-এর বেশি নয়, প্রশ্ন-পত্র হ'তে প্রশ্ন-কর্ত্তার মনোজগতের খবর লওয়াও অনেকটা ততখানি।

বহুদিন আগে শিক্ষা-বিভাগের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী বলেছিলেন যে, প্রশ্ন করবার সময় প্রত্যেকেই নিজেকে পরীক্ষার্থীদের কোঠায় নামিয়ে নেন। খুব ভালো কথাই, স্বীকার করি। যিনি বড়ো হয়েছেন, ক্ষণেকের জন্যে ছোটোর সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়ায় তাঁর ব্যক্তিত্বের যতটুকু অপচয় হয়, তাতে তাঁর গৌরবই। যাক্, সে-বিষয়। আমাদের কথা প্রশ্নকর্ত্তা নিজেকে কতটুকু ধরা দেন, এ নিয়ে।

যে প্রশ্নকর্ত্তা সংক্ষিপ্ত-সার লিখ', 'গল্পটি নিজ ভাষায় বলো, 'একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখ' ইত্যাদি প্রশ্ন করেন, তাকে মামুলি বল্‌তেই হ'বে। যিনি গতানুগতিকতা হ'তে একটু বিচ্যুত হ'য়ে, ছাত্রগণের মনোবৃত্তি, মেধা, বুদ্ধি ও রস-বোধ পরীক্ষা করতে চান, তাকে আমরা বড়ো স্থান না দিয়ে পারি নে। রসায়ন শাস্ত্রের-অধ্যাপক যখন, 'Discuss the romance of Hydrogen and Oxygen when electricity is passed through them,' এ প্রশ্ন করেন, তখন মনে হয়, তিনি বোক্কাসিও বা *Tales of Chivalry* পড়লেও পারতেন—রসায়নে তাঁর কপালে দুর্ভোগ হ'তে পারে। পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক, 'Unlike poles attract' এ প্রশ্ন করে যখন আরো বলেন, 'Show how it applies to

human kingdom', তখন তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভরসা হয় না। অর্থনীতির অধ্যাপক 'সমবায়-ঋণ-দান-সমিতি' সম্বন্ধে যখন শেলীর '*Love's Philosophy* উদ্ধৃত করে বলেন, 'Discuss how this gives the central idea of Co-operation', তখন মনে হয়, শেলী নিশ্চয়ই অর্থনীতির ছাত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রশ্নকর্তা কলেজে পড়ান না, নিজে গতন্তু দেবের ক্লাশের ছাত্র। বাংলার প্রশ্ন করিতে গিয়ে যিনি ইংরাজীর বহরে জগৎ স্তম্ভিত করতে চান, তিনি কোন্ ভাষা জানেন, সে সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হয় বই কি। 'মেঘনাদবধ' হ'তে যিনি প্রশ্ন করেন, 'Summarise Megnad-badh', তাঁর শাদা বুদ্ধির প্রশংসা কে না করে? রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা বধূ' কবিতা হ'তে যিনি দার্শনিকী প্রশ্ন করেন, 'Show how this poem marks the stages in the growth of the mind of man towards the attainment of God', তখন তাঁর জ্ঞান-গভীরতায় বৌদ্ধিমক ভয় পাই। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' হ'তে যিনি প্রশ্ন করেন, 'Show how this novel illustrates that we should respect our parents', তাঁকে কৃপা না করেই চলে না। *Special Bengali for Women Candidates*-দের প্রশ্নে যিনি 'নারী দেবী', এ সম্বন্ধে রচনা লিখতে দেন, তাঁকে অকপট বলতে সাহস করি নে। যদি কোনো বয়োবৃদ্ধ (হয়তো জ্ঞানবৃদ্ধও) প্রশ্নকর্তা শুদ্ধ করতে দেন—"পতিই শতী নারীর গতি, সুতরাং পতির বার্দ্ধক্যে তাহার যে মনাস্বস্থ থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?" তখন, তাঁর গলদ কোথায়, তা'ও যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।

ইংরেজীর-প্রশ্নকর্তা যদি প্রথমেই *N. B.* দিয়ে বলেন, 'Give in your *own* English the answers of the following' তবে বুঝতে হবে, তিনি স্বদেশী-ইংরেজীকে উপেক্ষার চোখে দেখেন

না। শেলীর Skylark কবিতার প্রশ্ন করতে গিয়ে যিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'Point out the inconsistency in the line—*Bird thou never wert*", তখন আমাদের মনে হয়, প্রশ্নকর্তা সাহিত্য-বিভাগে অনধিকার প্রবেশ লাভ করেছেন। Wordsworthএর *To the Cuckoo* কবিতা হ'তে যিনি প্রশ্ন করেন, 'The longing for the cuckoo symbolises the poet's quest for his ideal', তিনি Words worth-এর মতো সোজা কবিকেও কঠিন করে বুঝ্তে পারেন, এ কথা নির্ব্বিচারে বলা যায়।

যিনি বেশি বেশি '*Simplification*' কষ্তে দেন, তিনি লোক তত সরল না-ও হতে পারেন। আর যিনি জ্যামিতির প্রতিপাদ্য কষতে দিয়ে শুধু 'Traces of Construction' চেয়েও তৃপ্ত হন না, প্রমাণটিও চান, তিনি বাড়ীতেও অনেককেই সুস্থ থাকতে দেন না বলে মনে হয়। আর যিনি, 'Divide Rs. 40/- among 100 boys and girls so that a boy may get-/4/- *as.* each and a girl -/8/- *as* each. Find the number of boys and girls-এরূপ অঙ্ক দেন তাঁকে সমদর্শী বল্তে বিবেক চায়না।

এতেই মনে হয়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তার মনোবৃত্তি বের হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা